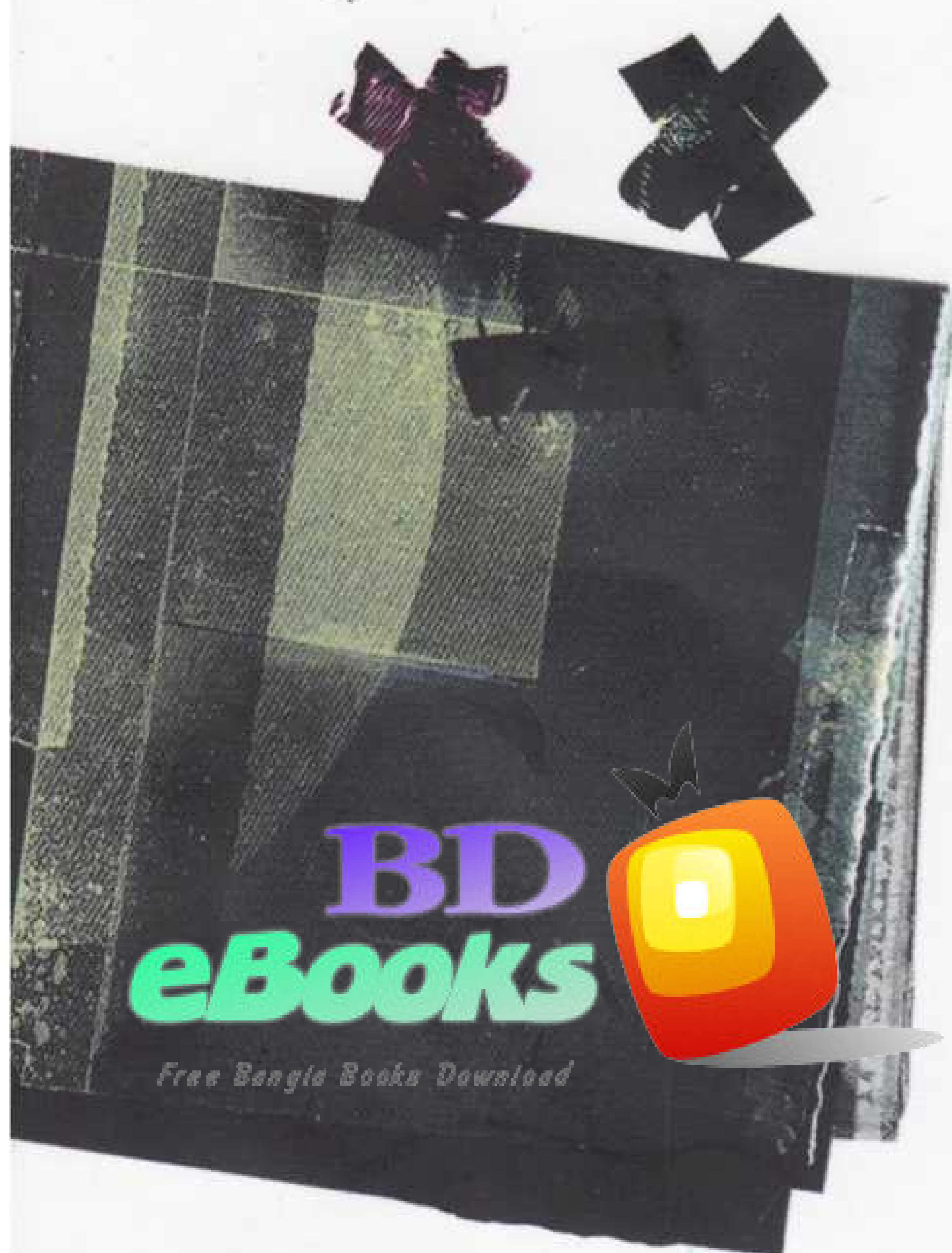
ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল

আনিসুল হক




বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো :
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, অথবা ভগ্নীকে ?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী— কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা ?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।
তোমার দেশ ?
জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য ?
পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে— দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন ?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাসো তুমি ?
আমি ভালোবাসি মেঘ... চলিষ্ণু মেঘ... ঐ উঁচুতে...ঐ উঁচুতে...
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল।

[শার্ল বোদলেয়ার : 'অচেনা মানুষ'
অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু]

রসিক সরকার গলাটা যথাসম্ভব ভারি আর নিচু করে বললেন, শামসু, তোমার ফোন। ফোনের রিসিভারটা তিনি রেখেছেন উল্টিয়ে, টেবিলের কাচের ওপর তা নৌকার মতো দুলছে।

শামস কবির কিঞ্চিত বিস্মিত! আমার ফোন! এ অফিসে সচরাচর তাকে কেউ ফোন করে না। সেও কাউকে না। রসিক সরকার (আসলে রসিদ সরকার, কোনো এক বিচিত্র কারণে এ অফিসের সবাই তাকে রসিক সরকার বলে) যেভাবে কণ্ঠস্বরে শ্বাস মিশিয়ে আবৃত্তিকারের ঢঙে কথা বললেন, তাতে এখানে উপস্থিত লোকজন ধরেই ফেললো, ফোনটা কোনো নারীকণ্ঠের। রসিক সরকারের কানে নারীকণ্ঠের আওয়াজ পৌঁছলে গলায় মাদকতা মেদুরতা ভর করে।

শামস কবির কম্পিউটারে একটা চিঠি মুসাবিদা করছিল। দাপ্তরিক চিঠি। চারপাশের কৌতূহলী চোখগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে ফোনটা ধরতে হবে। সে কিছুটা আড়ষ্টবোধ করছে। ইতিমধ্যে তার ফর্সা ভরাট গালে খানিক লালচে আভা দেখা দিয়েছে। কম্পিউটারে 'সেভ' কমান্ড দিয়ে সে উঠে পড়লো। নাহ! টেলিফোনে সহজ বাক্যালাপ করার বিদ্যেটা তার রপ্তই হলো না। অথচ দেখো কায়সারকে, ফোন যেন তার প্রেমিকা, পুরো সেটটা কোলের ওপর নিয়ে কেমন ফিসফিস করে কথা বলে। ঘাড় কাত করে মাথা ও কাঁধের মধ্যে রিসিভারটা এমনভাবে রাখে যে, দু'হাত সম্পূর্ণ ছাড়া, যা ইচ্ছা তাই করো দু'হাতে।

শামস কবির দুলন্ত রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো, হ্যালো! তার গলায় কাশি আটকে আছে, কণ্ঠস্বর খোলাসা হচ্ছে না।

হ্যালো! শামস কবির বলছেন!

খাইছে। এ যে নারী কণ্ঠ! শামস কবিরের কানের লতি রক্তিম ও উষ্ণ হয়ে উঠলো। তার বুকও একটু একটু করে কাঁপছে। শ্বাসও বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।

সে নিজেকে শক্ত করতে চাইলো। মনকে প্রবোধ দিলো, এ নিশ্চয় কোনো প্রতিষ্ঠানের মহিলা টেলিফোন অপারেটরের গলা। এরাই কেবল এভাবে কথা বলে। শামস কবির বলছেন ? হাইটেক লিমিটেডের এমডি সাহেব কথা বলবেন, হোল্ড অন প্লিজ।

জি, বলছি— শামস কবির সর্দি-গেলা কণ্ঠে বললো।

ওপার থেকে নারীকণ্ঠ কথা কয়ে উঠলো— যেন কথা নয়, ঝরে পড়তে লাগলো জ্যোৎস্না—

'পৃথিবীর শেষ রং মুছে গেলে পর
তোমার আঙুল-শীর্ষে ফুটেছে অজর
এক ফোঁটা লাল রং, জল টলমল
আমাদের দিনরাত রক্তিম তরল

তোমার জন্যে কি আমি অর্বুদ বছর
অপেক্ষা করি নি! বলো বিষণ্ন সুন্দর।'

শামস কবিরের সমস্ত মুখমণ্ডল লাল, শরীর অবশ, হাত-পা কাঁপছে, কী শুনছে সে, এ যে তারই রচিত কবিতার পঙক্তিমালা। সম্প্রতি 'রোদ্দুর' নামের একটা লিটল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে। খুবই অখ্যাত একটা লিটল ম্যাগাজিন। সে পত্রিকা এ নারী কোথায় পেলো! কেন সে তাকেই এই পঙক্তিগুলো শোনাচ্ছে ফোন করে ? কবিতা পড়ছে নাকি টেলিফোনের তার বেয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে জ্যোৎস্না; শামস কবিরের মনে পড়ছে শহীদ কাদরীর কবিতার লাইন– আমি জানি টেলিফোনের ওপারে তার ঠোঁট চড়ুই পাখির মতো কাঁপছে, কী জ্যোৎস্না কণ্ঠস্বরে– জ্যোৎস্না, যে রঙের কোনো নাম হয় না, না নীল না হলুদ, হয়তো গোলাপি, যেন কোনো স্বর্গীয় উদ্যান থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ পাঠিয়ে দিলো রঙিন সৌরভ, এই অফিস এখন গোলাপের গন্ধের মতো রঙিন, এই যে অটবির ফার্নিচার, এই যে দেয়ালে ঝুলন্ত কামরুল হাসানের ছবি, এই যে মেঝেজোড়া ধূসর রঙের কার্পেটি, এই যে বিজ্ঞাপনী সংস্থার নিজস্ব উদ্ভাবিত অভ্যন্তরীণ সজ্জা, কাঠের ফ্রেম, বড়ো বড়ো টবে পাতামেলা বাহারি সবুজ গাছ— সবকিছু যেন গোলাপি হয়ে যাচ্ছে— যেন এখন সুগন্ধেরও রং দেখা যাবে, পাওয়া যাবে শি[illegible] শব্দ, ভোর হওয়ার শব্দ, সন্ধ্যা নামার শব্দ, ফুল ফোটার শব্দ, কিংবা আকার [illegible], আকৃতি ধারণ করবে ভোরের আলো, আকাশের জ্যোৎস্না, দিবসের স্বপ্নসমূহ।

হ্যালো, কে বলছেন ?

আমি ? আমি আপনার একজন পাঠক।

আপনার নাম ?

নাম। থাক, আজ আর নাম [illegible] শুধু বলি, আমি আপনার খুব ভালো একজন পাঠক। অনুরক্ত পাঠিকা।

পাঠিকা! আমি তো তেমন কিছু লিখি নি।

লেখেন নি!

কই তেমন কিছু...

কী বলছেন! রোদ্দুরে যে কবিতাগুচ্ছ ছাপা হয়েছে, সেগুলো কার ?

ওগুলো অবশ্য আমারই। এর বেশি কিছু তেমন কোথাও কিছু ছাপা হয় নি।

কেন। এর আগে আপনাদের ডিপার্টমেন্টের ম্যাগাজিনের কবিতাটা।

কোন কবিতা ?

ওই যে, ছায়ামানবী। ওটা আপনার না ?

হ্যাঁ। সে তো অনেক আগে লেখা।

আগে লেখা হলেও খুব ভালো কবিতা। আমার মুখস্থ আছে।

কী বলছেন ?

সত্যি। বলবো—

ছায়াটা পড়ে আছে এবং কিছু রোদ
পেতেছি দুই হাত, পেতেছি অনুরোধ
ভেতরে জেগে ওঠে অন্যতর বোধ
ছায়া না রোদ নেবো, কে দেবে সম্বোধ
রোদেরা মরে আসে, ছায়ারও কায়া নেই
সারাটা ধরাধাম এখন ছায়াময়
সে ছিল মানবীই এখন ছায়া শুধু
ছায়াতে হাত পাতি, শূন্যে বাজে ধুধু।

সত্যি সত্যি মেয়েটা কবিতাটা মুখস্থ বলছে নাকি। তা হয়তো নয়। নিশ্চয় ডিপার্টমেন্টের ম্যাগাজিনটা কোনো কারণে হাতের কাছে ছিল। দেখে দেখে পড়ছে। তা কেউ পড়তেই পারে, কিন্তু কেউ কেন তারই দুটো কবিতা একসঙ্গে পড়বে, তাও একাকী নিভৃত পাঠ নয়, টেলিফোনে স্বয়ং কবিকেই শুনিয়ে শুনিয়ে সরব পাঠ।

আপনি কে, বলেন তো?

বললাম তো আপনার পাঠিকা। বড়ো ভালো লেখেন আপনি!

সত্যি বলছেন! নাকি ফাজলামি করছেন।

ফাজলামি করবো? একজন কবির সঙ্গে [illegible]

না, মানে, হয়তো, আপনি আমাদের কোনো বন্ধুর বোন বা বন্ধুর গার্লফ্রেন্ড। আমার বন্ধুটি হয়তো আপনার পাশে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসছে।

বাহবা। আপনি তো ভালো কল্পনা করতে পারেন। পারবেনই তো। কবি যে!

কী। ঠিক ধরেছি না।

মোটেও না।

আপনার পাশে কেউ নেই?

না।

না থাকুক। আপনি আমার কোনো বন্ধুর কেউ।

না।

আমার কোনো আত্মীয়। কোনো ভাবি, ভাগ্নি।

একদমই না।

তাহলে?

তাহলে আমি হলাম আপনার পাঠিকা।

আমার পাঠিকা, নাকি আমার কবিতার।

ওই একই কথা। আপনার কবিতার।

শোনেন। বস এসে গেছে অফিসে। এখন ফোন রাখি। হ্যাঁ?

আচ্ছা। পরে আবার ফোন করবো। ঠিক আছে? -

আচ্ছা। করবেন। রাখি।

শামস কবির ফোন রেখে দিলো। এদিক-ওদিক তাকালো। নাহ! কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই। যাক বাবা, বাঁচা গেছে। অবশ্য যতোক্ষণ সে কথা বলছিল, তার মনে হয়েছে, সবগুলো চোখ তার দিকে তরতর করে তাকিয়ে আছে। আসলে তা নয়। তাহলে? শামস কবিরের সমস্ত ব্যাপারটা অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে। সে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। ধাতস্থ হতে তার সময় লাগবে। অফিসে সত্যি সত্যি বস এসে গেছেন। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞাপনী সংস্থা। নাম উপনয়ন। মালিকের নাম নয়ন। বউয়ের নাম উপমা। দুটো নাম মিলে উপনয়ন। চমৎকার নাম!

নয়ন ভাই এসে গেছেন অফিসে। সঙ্গে একটা হটপটে ভাবি গরম ভাত ভরে দিয়েছেন। ড্রাইভার সেটা নিয়ে তার পিছে পিছে এসেছে যথারীতি। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অফিস ঠাণ্ডা। সবাই গভীর মনোযোগে নিজ নিজ টেবিলে বসে কাজ করছে। অফিস ম্যানেজার রসিক সরকার তার চেয়ারের উপর মোজা শুকুতে দিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি করে মোজা সরিয়ে নিশ্চয় পকেটে ভরেছেন। সাধে কি আর তার নাম রসিক সরকার। পকেট থেকে ঘর্মাক্ত মোজার গন্ধ বেরুবে। ভুরভুর। রসিক নামের উপযুক্ত কাজই বটে।

শামস কবির স্তব্ধ হয়ে বসে আছে চেয়ারে। কাচঘেরা নিজ চেম্বারে বসেছেন নয়ন ভাই। সেদিকে শামস কবিরের খেয়াল নেই। সে আপন আপনাতে আপনিই বিভোর। তার মনে হচ্ছে ফোনালাপটা যদি শেষ না হতো। যদি অনন্তকাল ওই মানবীর কণ্ঠস্বর তার সমস্ত সত্তায় এমনি করে জ্যোৎস্না ঢেলে দিতো।

শামস কবির নিজের টেবিলে ফিরে এলো। কম্পিউটার অন করা। স্ক্রিনসেভার— নীল রঙের সমুদ্রে লাল রঙের মাছ কিলবিল করছে। কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো— সেও যেন ঢুকে গেছে এমনই নীল সমুদ্রে, চারদিকে খেলা করছে রঙিন মাছেরা। এই স্বপ্নটা এক্ষুণি ভেঙে যাবে, যদি মাউসটায় সামান্য টোকা পড়ে। পর্দা জুড়ে বেরিয়ে পড়বে তার সেই চিঠিটা, একটু আগে সে যা লিখছিল। না, এই সমুদ্রসমান স্বপ্নদৃশ্যটি সে হাতের সামান্য টোকায় ভেঙে ফেলতে চায় না। কেমন ঘোরঘোর লাগছে। এ অফিস, তার লোকজন, আসবাব— সবকিছুই তার কাছে মনে হচ্ছে দূরবর্তী— কেমন অন্যলোকের। আসলে সেই তো চলে গেছে অন্য জগতে।

কী জ্যোৎস্না কণ্ঠস্বরে!

কিছুই তো নয়। একটা ফোন শুধু। কিছু কথা। তেমন দরকারি কোনো কথা নয়। মহামূল্যবান কোনো ঘোষণা নয়, বিবৃতি নয়, অনুরোধ নয়, স্বীকারোক্তি নয়। কিছু এলোমেলো কথা।

শামস কবিরের কানে যেন মধু লেগে আছে।

ব্যাপার কী?

একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই এই যে, ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠটি নারীর। শামস কবির সংবেদনশীল তরুণ। অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ। যাকে বলে রোমান্টিক। নানা গল্প-কবিতা

পড়ে, গান শুনে নারী ধারণাটি সম্পর্কে তার তৈরি হয়েছে এক অন্যরকম মোহ। নারীকে সে ভেবেছে রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশীর' মতো— 'নহ মাতা নহ বধূ নহ কন্যা, হে নন্দনবাসিনী উর্বশী'। তার ওপর ছোটবেলা থেকেই সে নারী-সংসর্গ-বিবর্জিত। একমাত্র নারী মা— তাকেও সে দেখেছে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত সামলাতে ব্যস্ত, নুনে-হলুদে মাখা শাড়ির আঁচল লুটোচ্ছে রান্নাঘরের ধুলোয়, হাতে খুন্তি। তারা তিন ভাই। বড়ো দুভাই থাকেন স্টেটস-এ। বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক বাবা মারা গেছেন বেশ কবছর আগে, যখন শামস কবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ডইয়ারে। দুভাই মাকেও নিয়ে গেছে নিউইয়র্কে। দেশে এখন সে একা। থাকে মগবাজারের একটা ভাড়া বাসায়। চিলেকোঠার সঙ্গে বানানো একটা চমৎকার ঘরে। ঘরের সামনে বিস্তৃত ছাদ। যেন মেঘলোকে অধিবাস তার। ছোটবেলা থেকেই সে অন্তর্মুখী। যেচে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে না। আর মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা তো তার জন্য পুলসেরাত পার হওয়ার মতো কঠিন ব্যাপার।

মেয়েদের সঙ্গে তার কথা হয় কল্পনায়। তাদের দিনাজপুরের মুন্সিপাড়ার ফুল ও সব্জি বাগানঘেরা ছোট বাসাটির পেছনে তিন বাড়ি পরে বকুল নামের একটি মেয়ে থাকতো, বাঁ পা ছোট ছিল বলে খুঁড়িয়ে হাঁটতো বকুল, আর শামস কবিরদের বাসার সামনে আচারওয়ালাটা সাইকেলের দুটো চাকা দিয়ে বানানো গাড়িতে পসরা সাজিয়ে রাখতো বলে বকুলকেও রোজ সকাল ৯টায় এখানটায় একবার দেখা যেতোই। বই-ছেঁড়া কাগজের একপিঠে জলপাই কি চালতার আচার— খুচরো পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে বকুল ফিরে যেতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে। সকালবেলার রোদে তার ছায়া পড়তো পেছন দিকে। নিজেদের বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে শামস কবির সে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে থাকতো, ছায়াটা খোঁড়াচ্ছে, পথের মধ্যে পড়ে থাকা ছায়া, পথ ঘুরে গেলে বকুলের ছায়াটা একটা দেওয়ালে পড়লো। ওই ছায়াটাও বাঁ দিকে একেকবার হেলে যাচ্ছে, শামস কবির তাকিয়ে থাকতো। তার খুব ইচ্ছে করতো বকুলের সঙ্গে গল্প করে। বকুল যে ঠিক সকাল ন'টাতেই একবার আসে, শামস কবির সেটা বুঝে ফেলেছিল। তাই সকাল ন'টা হবার আগেই সে তাদের বারান্দায় এসে বসতো।

অবশ্য বকুল চলে যাবার খানিকক্ষণ পরেই পত্রিকা দিয়ে যেতো হকার, দৈনিক ইত্তেফাক, বলাই বাহুল্য আগের দিনের। তখন পত্রিকার গায়ে তারিখ থাকতো দুটো। মফস্বলের জন্য বরাদ্দ থাকতো একদিন পরের তারিখ।

কিন্তু বকুলের সঙ্গে তার তেমন কোনো কথা কোনোদিনও হয় নি। অথচ বকুলকে নিয়ে সে কম ভাবে নি। মাঝেমধ্যে ভাবতো, যদি এমন হয়, বাসায় কেউ নেই, বাবা কলেজে, মা বেড়াতে গেছে বাইরে, ভাইয়েরাও, সে একা বাসায়, বকুল এক বাটি তরকারি নিয়ে তাদের বাসায় হাজির হয়, তো বেশ হয়।

বকুল এসে জিজ্ঞেস করবে, কই, খালাম্মা কই?

সে বলবে, বেড়াতে গেছে।

বাসায় কেউ নেই?

কেন, আমি তো আছি।

কেন, আমি তো আছি— এই একটি বাক্য সে বকুলকে বলতে চায়। বলা হয় না।

অথচ দ্যাখো, বহুদিন পরে যখন তার ডিপার্টমেন্টের ছেলেরা বললো, ম্যাগাজিন বের করবে, সাহিত্য সংকলন, তখন কিন্তু কবিতা লিখতে বসে শামস কবির লিখেছিল ছায়ামানবী, কোন কৈশোরকালের এক খোঁড়া বালিকার ছায়া কতো দূর থেকে তার কবিতায় ভর করেছে।

অবশ্য ডিপার্টমেন্টের একটা জুনিয়র মেয়েকেও তার চোখে ধরেছিল। জয়িতা। কিন্তু জয়িতাকেও সে কোনোদিন মুখ তুলে কিছু বলেনি। জয়িতাকে তার ভালো লেগেছিল। কারণ জয়িতা মেয়েটা শ্যামলা। চোখ ডাগর ডাগর, নাক সরু, তার মাথায় একরাশ কালো চুল, আর মেয়েটিকে দেখলেই মনে হয়, সে বিষণ্ণ। তখন সবে শামস কবির বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ করা বোদলেয়ারের কবিতা পড়ছে। ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু যা লিখেছেন, তা সংক্রামক রোগের মতো ঢুকে যাচ্ছে শামস কবিরের রক্তে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে— 'রূপসী ও বিষাদময়ী সমার্থক এবং যে নারী চুম্বনযোগ্য তার চোখ অশ্রুতে মলিন।' ক্লাসরুমের বারান্দায়, ক্যাম্পাসে, এখানে-ওখানে দু'একবার জয়িতার চোখে চোখও পড়েছিল তার; সূর্যসেন হলে তার রুমে ফিরে এসে শামস কবির লিখেছিল—

ওই মেয়েটি বিষাদ অবনতা
ওই মেয়েটির চোখের মধ্যে পুকুর
ওই মেয়েটি শান্ত সন্ধ্যাবেলা
ওই মেয়েটি বাসি বকুল ফুল
ওই মেয়েটি মেঘের মতো [illegible]
ওই মেয়েটি শব্দ খোঁটে [illegible]
বুকের মধ্যে ওই মেয়েটির ছায়া
ছায়ার মধ্যে ওই মেয়েটি নেই।

ওই মেয়েটি কিন্তু কোনোদিনও জানবে না, জানেনি যে, একজন তরুণ গোপনে তাকে নিয়েই কিছু পঙক্তি রচনা করে রেখেছে। জয়িতার সঙ্গে একদিনই কথা হয়েছিল শামস কবিরের। একদিন সে একগুচ্ছ কাগজ কুড়িয়ে পেয়েছিল ডিপার্টমেন্টের বারান্দায়, তুলে নিয়ে ভেতরে দেখতে পেয়েছিল একটা আইডেনটিটি কার্ড, কার্ডের ছবি ও নাম দেখেই তার দম বন্ধ হবার যোগাড়— এই বুঝি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। আইডি কার্ডটা জয়িতার, সেটা ফেরত দেওয়ার কাজটাকে সে গ্রহণ করেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে জরুরি কাজ বলে। সেদিন সে জয়িতাকে আর তাদের ক্লাসে পায়নি; সারা রাত জয়িতার ছবি তার কাছে, উত্তেজনায় তার ঘুম আসছিল না। কীভাবে সে পরদিন জয়িতার দেখা পাবে, কীভাবে তাকে খুঁজবে, সে কি দাঁড়িয়ে থাকবে জয়িতাদের শ্রেণীকক্ষের সামনে, জয়িতার দেখা পেলে তাকে কীভাবে ডাকবে, কী বলে ডাকবে, আপনি বলবে নাকি তুমি বলবে— এইসব ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে সারা রাত তার ঘুমই এলো না। কিন্তু পরদিন ঘটনা ঘটলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত; ক্লাসরুমের সামনের বারান্দায় জয়িতা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, শীতকাল, রোদটা মিষ্টি লাগছে; দুরু দুরু বক্ষে শামস কবির গেলো

সেদিকে। বললো, শোনো, তোমার আইডি কার্ড... কথা আর বেশি দূর এগোলো না, উপস্থিত ছেলেমেয়েরা তার দিকে তাকিয়ে আছে, ছেলেটা কী বলে, কী বিষয়ে বলে বোঝার জন্য তারা উৎকর্ণ। ততোক্ষণে মোটা শার্টের বুক পকেট থেকে আইডি কার্ডটা বের করে সে দিলো জয়িতার হাতে, আর জয়িতা নিজের ওপর বিরক্ত হয়েই যেন বললো, শিট, আইডি কার্ডটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম নাকি! শিট, এ শব্দটার জন্য শামস কবির প্রস্তুত ছিল না। একটা বিষণ্ন শ্যামলা-রঙ-তরুণী কেন তার চমৎকার পাতলা ঠোঁট, জিভ, দাঁত আর বাগযন্ত্র ব্যবহার করে 'শিট' বলবে? শিট মানে কী? গু। কোনো মেয়ে এরকম সবার সামনে একটা অপরিচিত সিনিয়র ছাত্রকে দেখে প্রথম শব্দ হিসেবে বলতে পারে 'গু'। আইডি কার্ড আর কাগজপত্র হস্তান্তর করে শামস কবির চলে এসেছিল অকুস্থল থেকে। এই ঠোঁটে-শিটধারী মেয়ের সঙ্গে আলাপের আগ্রহই সে হারিয়ে ফেলেছিল।

নয়ন ভাই ডাকলেন, কবির, এই কবির।

কবির বসে আছে কম্পিউটারের সামনে, মাউসে হাত দিয়ে সে একবার তার অফিসিয়াল চিঠিটি বের করেছিল, আবার আত্মমগ্ন হয়ে পড়ায় স্ক্রিন সেভারের সমুদ্রটা কম্পিউটারের পর্দা জুড়ে ভেসে উঠেছে; নয়ন ভাইয়ের ডাকে সে সংবিত ফিরে পেলো। আবার মাউসে হাত দিলো— আবার বেরিয়ে এলো চিঠিটা।

সে সিট থেকে উঠে গেলো নয়ন চৌধুরীর কা[illegible] চেম্বারে, দরজা ধরে দাঁড়ালো নীরবে।

নয়ন ভাই বললেন, কবির, কই, চিঠিটা [illegible]

হয়ে গেছে। প্রিন্ট আউট বের করে দি[illegible]।

ওপাশ থেকে এগিয়ে এলেন রসি[illegible] সরকার, এই শামস্, তোমাকে না বললাম, চিঠিটার কপি বের করে রাখো। সম[illegible] কাজ সময়ে করবে না?

রসিক সরকার এখনও খালি পা। তার দু'পকেট থেকে ঘর্মগন্ধময় মোজা-জোড়া নীড় থেকে উঁকি দেওয়া বাবুই পাখির মতোই বের হয়ে আছে।

রসিক সরকার সরাসরি মিথ্যে কথা বললেন। মালিককে খুশি করার জন্যই এই সামান্য মধুর মিথ্যাভাষণ। তার মুখের ওপর যদি বলে দেওয়া যেতো, না রসিক মশায়, আপনি মোটেও আমাকে চিঠিটা বের করতে বলেননি। এতোক্ষণ আপনি টেলিভিশনে ফ্যাশন চ্যানেল দেখছিলেন। জালপরা সব মেয়ে তাদের স্তনবৃন্ত দেখাচ্ছিল, ছোট্ট টিভির পর্দাটা একেবারে আপনার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আপনি এমনভাবে গিলছিলেন, যেন আপনি চোখে দূরবীণ লাগিয়ে ঈদের চাঁদ খুঁজছেন। শামস কবির অবশ্য রসিক সরকারকে এসব কথা শুনিয়ে দিতে পারলো না। তা সে কোনোদিনই শোনাতে পারবে না। তার চরিত্রের মধ্যেই উচ্চকণ্ঠ হওয়া বা বিরোধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা নেই। এক্ষুণি বের করে দিচ্ছি নয়ন ভাই— বলে শামস কবির নিজের ডেস্কে ফিরে এলো। চিঠিটা অর্ধেক মুসাবিদা করা আছে। বাকিটা করতে হবে। চিঠির বিষয় খুবই গতানুগতিক। একটা ডেস্ক ক্যালেন্ডারের জন্য কোটেশন। এ ধরনের চিঠি হার্ডডিস্কে আরো আছে। শুধু প্রাপকের নামটা বদলে দিলেই হলো। তবু কাজটা করতে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ছোটখাটো সব ভুল হচ্ছে।

সে নিজেকে বললো, মনোযোগ দাও শামস কবির, মন দিয়ে কাজটুকু করো। ভেতর থেকেই উত্তর এলো, মন আজ কাজে নেই তো, কোথেকে দেবো। মন চলে গেছে অন্য কোথাও, এক অপরিচিত নারীসত্তার খোঁজে– যে মেয়েটির কণ্ঠস্বর অসম্ভব মায়াবী, যে মেয়েটি তাকে সম্বোধন করেছে কবি বলে আর যে মেয়েটি তার কবিতার ভক্ত। ফোনে মেয়েটি তাকে শুনিয়েছে তারই রচিত কবিতা— দু'দুটো। উফ্‌ফ্‌। তার পরেও কি একটা চিঠিতে গোটা তিনেক ভুল করার অধিকার সে রাখে না ?

কোটেশন লেটারটার মুসাবিদা শেষ করে সে লেজার প্রিন্টারে একটা কপি বের করলো। তাদের লেজার প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট আউট নেওয়ার সময় কাগজটা বেশ গরম হয়। এটাকে সে বলে 'গরম গরম পরিবেশন করা'। তিন পৃষ্ঠার কোটেশনপত্রটা বের করে প্রথমে সে নিয়ে গেলো রসিক সরকারের কাছে। সরকার একনজর দেখে বললো, ঠিকই আছে, বাম পাশে মার্জিন আরেকটু বেশি রাখতা। যাও, বসরে দেখাও, দেখো উনি কী বলে।

নয়ন চৌধুরীর সামনেও তিন পৃষ্ঠার চিঠিটা সে নিয়ে গেলো গরম গরমই। কিন্তু নয়ন ভাই একনজর দেখেই তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। বললেন, সবই ঠিক আছে কবির, কিন্তু এই চিঠিটা জমা দিলে আমার উপনয়ন লিঃ নগদ [illegible] লাখ টাকা লস খাবে।

শামস কবির ভ্রু কুচকে নয়ন চৌধুরীর দিকে চেয়ে বললো— ঘটনা কী, কী ভুল করলাম।

তুমি তো ৬ পৃষ্ঠার ক্যালেন্ডারের কস্টিং দেখাইছো ১২ পৃষ্ঠার ক্যালেন্ডারে। ভাগ্যিস আমি আন্ধাধান্ধা সই করি নাই। ও রসিদ ভাই, আপনি জিনিসটা একটু দেইখা দিবেন না ?

রসিক সরকার বললো, কী শামসু, আমারে দেখাইবা না ? কী করছো ?

আরে কস্টিং ঠিক নাই। ডাবল [illegible] তো। রেট বাড়ায়া দ্যান— নয়ন চৌধুরী বললেন।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাই তো হবে। [illegible]র আজকালকার ছেলেপুলে একটা কস্টিং পর্যন্ত বার করতে পারে না। বসের আগে তোমার তো উচিত ছিল আমাকে দেখানো— রসিক সরকার বললেন।

শামস কবির তখন নিজের জিভ নিজেই কাটছে লজ্জায়। এই ভুলটা সে করলো কী করে। কিন্তু রসিক সরকারের এইসব উপরওয়ালা-ভজানো কথায় সে গা করলো না। যদিও একবার তার মনে হলো বলে, ও রসিক মিয়া, তোমারে তো মিয়া দেখাইছি, তুমি তো মিয়া মার্জিন ছাড়া কিছুই চোখে দেখলা না। দেখবা কেমনে, সারাক্ষণ ফ্যাশন চ্যানেলের লম্বা লম্বা মডেলগুলানের বুক দেইখা তো মিয়া মগজ পচাইছো। কিন্তু সে বললো না। বহু কথা সে বলতে পারে মনে মনে, কিন্তু যাকে বলার কথা তার মুখের ওপরে কিছুই বলে উঠতে পারে না।

ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি ঠিক করে আনছি— শামস কবির বললো।

নয়ন চৌধুরী বললেন, তাড়াহুড়োর কিছু নাই। একটু পরে দিলেও চলবে। বসো।

শামস কবির বসলো।

নয়ন চৌধুরী বললেন, একটা আইডিয়া বার করতে হবে। কবির, তুমিই পারবা। একটা কোম্পানি ইসবগুলের ভুসি বাজারজাত করছে। সুন্দর কৌটায়। বিউটিফুল প্যাকেজিং।

আমাদেরকে দিয়া পেপারের অ্যাড করাইতে চায়। একটা স্লোগান বার করতে হবে।

নাম কী ইসবগুলের ?

হাইজিন!

> ভাবি নিন, ভাই নিন
> শোবার আগে হাইজিন

মাথায় ছড়া এলো শামস কবিরের। কিন্তু এটাও সে মুখে বললো না। মুখে কোনো আইডিয়া দিতে হয় না। লিখিত দেওয়াটাই দস্তুর। তাছাড়া ভাবি নিন, ভাই নিন, শোবার আগে হাইজিন— কথাটার মধ্যে কোথায় যেন খানিক অশ্লীলতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিক আছে, আমি ভেবে লিখে আনছি— শামস কবির বললো নয়ন চৌধুরীকে।

নয়ন চৌধুরী প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। কবির ছেলেটা ভালো, যাকে বলে সৃজনশীল। তার বানানো একটা স্লোগান এখন অনেকেরই মুখে মুখে— হালকা হালকা হাওয়াই চপ্পল...। ফোমের স্যান্ডেলের নাম 'হাওয়াই চপ্পল' রাখার কৃতিত্বটাও শামস কবিরেরই। সেটা কিন্তু কেউ জানে না। যেমন এরশাদের '৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে' স্লোগানটাও দেশের একজন বড়ো লেখকের দেওয়া, সেটা এরশাদ যদি স্বীকার করেও, ওই লেখক কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবেন না।

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রটাই এরকম। পণ্যের প্রচার হয়, মডেলরা সুপারস্টার হয়, পত্রপত্রিকায় তাদের নিয়ে খবর বের হয়, স্ক্যান্ডালও ছড়ায়, কিন্তু নেপথ্যের সৃজনশীল কর্মীটির কথা কেউ জানে না।

শামস কবিরের মস্তিষ্কে স্থান-কাল-পাত্রের যে স্বাভাবিকতা, সেটাই যেন উল্টে গেছে। মনে হচ্ছে, সময় যেন সকাল থেকে গড়িয়ে দুপুর-বিকেল-সন্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে না, উল্টোপথে হাঁটছে, হয়তো সন্ধের পর বিকেল হচ্ছে, বিকেলের পর দুপুর।

এই তো আজ সকালবেলা সে গোসল করতে গেছে, ঝর্ণা ছেড়ে দিয়েছে, খানিকক্ষণ ভেজার পর তার মনে হলো, সে জামা-জুতা-ঘড়ি সব পরে আছে। ব্যাপারটা ঘটলো কী করে! সকালবেলা তো তার জামা-জুতা পরে থাকবার কথা নয়। আর গোসল না সেরেই বা কেন সে এসব পরবে।

শামস কবির আসলেই এখন ঘোরের মধ্যে আছে। ভেজা জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মাথা মুছতে মুছতে সে এ হিসাবটাই করতে থাকলো। একটা নারীকণ্ঠের মিনিট পাঁচেকের টেলিফোন-বার্তা পেয়েই তার জীবনের গতি-ছন্দ সব অন্যরকম হয়ে গেলো কেন ? কেবল টেলিফোনের অপর পারের কণ্ঠটি নারীকণ্ঠ বলে! কিন্তু সেই যে সেবার

একটা নারীছায়া তার ওপর এসে পড়েছিল প্রবলভাবে, তা তো তার হৃদয়ে এতোখানি রেখাপাত করেনি।

সে তখন উপনয়নে নতুন জয়েন করেছে। কাজকর্ম তেমন করে বুঝে ওঠা হয় নি, লোকজনের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটাও তেমন খোলাসা নয়। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎই তার অফিসে দুজন তরুণী এসে হাজির। তরুণীর আগমনও এ অফিসে নতুন কিছু নয়। তাদের বিজ্ঞাপনী সংস্থাটি যদিও অ্যাডফিল্ম বানায় না, কিন্তু পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্যও তো মডেল দরকার হয়। অথচ ওই দুজন এসে আর কারুরই খোঁজ করলো না, খোঁজ করলো কিনা শামস কবিরেরই। শামস কবির তখন ব্যস্ত। রেডিওর জন্য পনেরো মিনিটের 'হারুন মশার কয়েল সঙ্গীতমালা'র পাণ্ডুলিপি লিখছিল। কাল রেকর্ডিং, স্ক্রিপ্ট আজ না দিলেই নয়। এমন সময় রসিক সরকার যখন কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, শামসু, তোমার গেস্ট, তখন শামস কবির খানিক বিস্মিত। কারা এরা। চোখ তুলে ভালো করে তাকাতেই বুঝলো— একজন শায়লা। তার ছোট খালার বড় মেয়ে। বগুড়ার মেয়ে— বললো উচ্ছল গলায়— ক্যা শামসু ভাই। চিনিচ্ছো না, হামি শায়লা। এরপর না চেনার প্রশ্নই আসে না। সঙ্গের মেয়েটি কে ? আসো শামসু ভাই, তোমার সাথ পরিচয় কর‍্যা দেই। এই তানিয়া, আমরা এক সাথে পড়িচ্ছি।

এক সঙ্গে পড়ছো মানে ? তুমি কি ভর্তি হয়েছো নাকি ?

না। ভর্তি হওয়ার জন্যে পড়িচ্ছি, কোচিং সেন্টারে।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। চলো, একটু কোক খেয়ে আসি।

শামস কবির তাড়াতাড়ি ওদের বাইরে নিয়ে গেলো। একটা ফাস্টফুডের দোকান আছে পাশেই। পড়ন্ত দুপুরে দোকানে ভিড় ছিল কম। লাল রঙের সসমাখা ম্যালামাইনের থালায় একটা মাছি ভন ভন করছিল।

আড়চোখে শামস কবির একবার শায়লাকে দেখলো, একবার তানিয়াকে। তানিয়া মেয়েটার চোখমুখ সুন্দর, যদিও সামান্য মোটার দিকেই তার গড়ন। শায়লা মেয়েটাকে অবশ্য কোনোদিনও শামস কবিরের চোখে লাগেনি, আজো লাগছে না। সে মনে মনে শায়লাকে ধন্যবাদ দেয় সঙ্গে তানিয়াকে আনার জন্য। তারচেয়েও শায়লার বেশি ধন্যবাদ পাওনা হলো। কারণ সে তানিয়ার সামনে শামস কবিরের নানা খ্যাতি করলো এবং তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিচয়টি— শামস কবির কবিতা লেখে— সেটিও সে বিবৃত করতে ভুললো না। এই ব্যাপারটিই আসলে শামস কবিরের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে কেবল সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্যের একজন কেজো মানুষই না বরং সে কবি। তার আছে একজোড়া অদৃশ্য ডানা, সেই ডানা দিয়ে সে উড়তে পারে নীলিমা ভেদ করে, মেঘে মেঘে।

সত্যি, আপনি কবিতা লেখেন ? তানিয়া জিজ্ঞেস করলো। মেয়েটার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সে কথা বলছে, না যেন হাসছে।

না, তেমন কিছু নয়। শামস কবিরের গণ্ডদ্বয়ে দেখা দিলো স্বভাবজাত লালাভ।

শায়লা বললো, শামসু ভাই, তোমার সাথে দ্যাখা করতে কিসক আসলাম, তাক পুছ করল্যা না।

কেন ?

শায়লা বললো যে, লেখাপড়া করতে তার ভালো লাগে না। তার জীবনের লক্ষ্য অভিনেত্রী হওয়া। সে জন্য প্রথমে সে কিছু মডেলিং করতে চায়। মডেলদেরকে টেলিভিশনের প্রযোজকরা প্রায়ই ডেকে থাকে অভিনয়ের জন্য। শামসু কি পারে না তাকে তাদের প্রতিষ্ঠানের কোনো বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার কাজ দিতে ?

শামস কবির বললো, ঠিক আছে, যদি তেমন কোনো কাজ আসে, সে তাকে খবর দেবে।

খবর দিবা। তুমি ঠিকানা জানো। ন্যাও। লেইখ্যা দিচ্ছি। কলাবাগানে মামার বাসাত উঠছি। তুমি তো একদিনও গেলা না। মামা-মামী খুব রাগ তোমার উপরে। যাও না ক্যা ? ফোন করো। ন্যাও, ফোন নাম্বার, ন্যাও।

মামার বাসার ফোন নম্বর আমি জানি।

মিনু খালার খবর কী। আমেরিকাত থাক্যা চিঠি লেখে ? ফোন করে ?

করে মাঝে মাঝে।

তুমি তোমার নিজের মায়েরও খোঁজ করো না। তুমি এংকা ক্যা!

তানিয়া বললো, শামস ভাইয়া। আপনার মা বুঝি আমেরিকায় থাকেন।

শামস কবির কিছু বলবার আগেই শায়লা বললো, হ্যাঁ। মিনু খালা স্টেটস-এ থাকে। বশির ভাইয়া থাকে। গিয়াস ভাইয়া থাকে। খালি শামসু ভাই একলা পড়্যা আছে বাংলাদেশত। ভাইয়েরা কতো ডাকাডাকি করে। শামসু ভাই যায় না। দেখা যাবে, কোনদিন শামসু ভাইও উড়াল দিছে।

তানিয়া মিষ্টি করে হাসলো। স্যান্ডউইচে ছো[illegible]র কামড় দিয়ে কোকের বোতল থেকে স্ট্র নিয়ে একটা চুমুক। শামস কবিরের বোতল উছলে এক ঝলক ফেনা পড়ে গেলো তার পরনের নীল জিন্সের ট্রাউজারে।

তানিয়া পাশে ছিল, নিজের হাতের টিসু দিয়ে সে মুছে দিলো শামস কবিরের হাঁটুর ওপরটা, শামস কবিরের শরীরের মধ্যে শিরশির করে উঠলো। কেউ টের পেলো না, তানিয়া নয়, শায়লা নয়— কী যে ঘটে গেলো শামস কবিরের শরীরে।

যাওয়ার আগে শায়লা বললো, শামসু ভাইয়া, তোমার একটা ভিজিটিং কার্ড দাও তো।

তানিয়া বললো, আমাকেও একটা দেবেন প্লিজ।

সে রাতে শামস কবির ঘুমোতে পারে নি। সারা রাত এপাশ-ওপাশ করেছে। তানিয়ার মুখ সে মনে করতে চেয়েছে। তাকে নিয়ে নানা কল্পনার জাল বুনেছে। ভেবেছে এমন কি হয় না, আগামীকাল একটা ফোন এলো অফিসে, হ্যালো, শামস কবির আছেন ?

হ্যাঁ, বলছি।

আমি তানিয়া।

কোন তানিয়া ?

ওমা। এরই মধ্যে ভুলে গেলেন। ওই যে গতকাল শায়লার সাথে আপনার অফিসে গেলাম।

হুঁ, হুঁ।

আপনি আমাদের কোক খাওয়ালেন।

হ্যাঁ। মনে পড়ছে।

আপনার হাঁটুর ওপরে কোক পড়ে গেলো।

আর আপনি মুছে দিলেন। ইস, আপনি কী করেছেন ?

কী করেছি ?

সর্বনাশ।

কেন ?

আমার সমস্ত শরীর আপনার সেই স্পর্শের জন্য কাঙাল হয়ে আছে।

সত্যি ?

শুনুন। হেলাল হাফিজের একটা কবিতা আছে, জানেন। একবার ডাক দিয়ে দ্যাখো, আমি কতোটা কাঙাল।

খুব সুন্দর কবিতা তো।

মানে বুঝছেন ?

হুঁ।

কী বুঝলেন। বলুন তো।

না। বলবো না। পারলে ডাক দেব। পারি যদি, অন্তরে অন্তরের ডাক পাঠাবো।

রবীন্দ্রনাথ!

হুঁ।

আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েন ?

উহুঁ। পড়ি না। শুনি। অবশ্য গল্পগুলো কে না পড়েছে।

সারারাত মনে মনে এমনই কথোপকথনের মহড়া চালিয়েছিল শামস কবির। ঘুম কিছুতেই আসছিল না। একটা মেয়ে এমনিভাবে হঠাৎ করেই তার নিদ্রাহরণ করে নিয়েছিল। এমনই কল্পনাবিলাসী ছেলে শামস কবির।

আবার পরদিন সত্য সত্যই টেলিফোন বেজে উঠেছিল। নারীকণ্ঠ বলে উঠেছিল, হ্যালো, শামস কবির আছেন ?

হ্যাঁ বলছি। শামস কবির এমনভাবে কাঁপতে শুরু করেছিল যে, পুরো অফিসই ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হওয়ার যোগাড়।

আমি তানিয়া।

তা-তা...।

ওই যে কালকে শায়লার সাথে আপনার অফিসে...।

জি, বলেন।

আমাকে চিনতে পেরেছেন তো।

হ্যাঁ।

শুনুন। আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। ভীষণ জরুরি!

কী কথা ?

এখনই বলবো না। ফোনে বলা যাবে না। আমি আপনার সাথে দেখা করে সামনাসামনি বলতে চাই। ঠিক আছে ?

আচ্ছা।

তাহলে আমি কি আপনার অফিসে চলে আসবো ?

না মানে ঠিক অফিসে না। অফিসে নানা লোক। অফিসিয়াল কিছু ?

না। অফিসিয়াল নয়। প্রাইভেট।

তাহলে অফিসে না।

তাহলে কোথায় ? আপনার বাসায় আসি।

বাসায় আসবেন ?

আপনি না চিলেকোঠার পাশে থাকেন। বিশাল একটা ছাদ নিয়ে। কবিদের মতো।

না, তেমন কিছু নয়।

আপনার বাসায় যেতে কোনো অসুবিধা আছে ?

অসুবিধা... মানে কী অসুবিধা...।

মানে বাসাওয়ালা কোনো ঝামেলা করবে না তো ?

তা করবে না মনে হয়। কিন্তু বাসায় কেন আসবেন ?

ওমা। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের বাসায় যেতে পারে না ?

না, মানে...।

শুনুন। অন্য কিছু নয়। আপনি একা বাসায় থাকেন। কেমন করে একজন মানুষ একা থাকে, সেটা দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হয়।

বাহবা। মেয়েটা রোমান্টিক আছে তো! শামস কবির ভাবে।

আপনি বেশ কৌতূহলী তো! ঠিক আছে। তা আপনাকে একদিন বাসায় আনা যাবে। কিন্তু তার আগে জেনে নিই, আপনার জরুরি কথাটা কী ?

সে কথা বলার জন্যই তো জায়গা খুঁজছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল পিজি হাসপাতালের নিচে পত্রিকার দোকানটায় বিকাল পাঁচটায় আসেন। ঠিক আছে ?

আচ্ছা।

এ তো আরো বড়ো সংকট হলো। আজই কেন মেয়েটা আসতে চাইলো না। কাল কেন ? এখন এই চব্বিশ কি ত্রিশ ঘণ্টা শামস কবির কাটায় কী করে ? কিন্তু যতো দুঃসময়ই হোক না সময় বসে থাকে না, দিন পার হয়ই। শামস কবির কী পরবে, পাঁচটার সময় পৌঁছতে হলে অফিস থেকে কয়টায় বেরোতে হবে— এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই একটা রাত পার হয়ে গেলো। নতুন ব্লেডে শেভ করতে গিয়ে গালটা কাটলো খানিক। আয়নায় থুতনিতে এক ফোঁটা রক্ত দেখে সে আবৃত্তি করতে লাগলো—

> সকালে ব্লেডের স্ট্রোকে কেটে গেলে গাল,
> ফিনকি দেয় যেই রক্ত তুমি তার লাল।

লন্ড্রি থেকে কাপড় ইস্ত্রি করিয়ে আনলো। তারপর যথাসম্ভব কেতাদুরস্ত হয়ে চললো অফিসে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। এ ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটে উল্টোটা। দেখা যায়, কোনো টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ দিন কালই, কাজ শেষ করতে করতে রাত এগারোটা-বারোটা বেজে যায়। আজ যদি এমনই কোনো হুলস্থুল বেধে যায়, তাহলে শামস কবির পেটব্যথায় কাতরে পড়বে, আর অফিস ত্যাগ করে যাবে হাসপাতালের উদ্দেশে। হাসপাতাল মানে পিজি হাসপাতাল। না। তেমন কোনো গোলযোগ ঘটলো না। মধ্যাহ্নভোজনের পরই ছুটি নিয়ে নিলো শামস কবির। পিজি হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে যদি পথে যানজট বাঁধে। পাঁচটার মধ্যে যদি সে পৌঁছাতে না পারে। মেয়েটি যদি তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে চলে যায়। কাজেই আগেভাগে রওনা দেওয়া ভালো। পিজির নিচে পৌঁছে কোনো একটা রেস্তোরাঁয় বসে চা-টা খেয়ে সময় কাটানো যাবে। পথে কোনো যানজট পড়লো না, আড়াইটার মধ্যেই সে শাহবাগ পৌঁছে গেলো। সে গেলো শাহবাগের বইয়ের দোকানগুলোয়, এসব দোকানে সে প্রায়ই আসে, কবিতার বই উল্টে পাল্টে দেখে, সম্প্রতি জয় গোস্বামীর কবিতা তার ভীষণ প্রিয় হয়ে উঠছে। এর আগে সে নিমগ্ন ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে, তারও আগে আবুল হাসানে। আবুল হাসান তার ঠোঁটস্থ এখনও, এ কারণে রিকশায় শাহবাগের দিকে আসতে আসতে আওড়াচ্ছিল— এই ভ্রমণ মানে আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া। শাহবাগের বইয়ের দোকানে বই উল্টেপাল্টে তার সময় খানিকটা গেলো। পকেটে পয়সা ছিল বলে মাত্র ১৮ টাকায় সে একটা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই কিনলো— এই আমি, যে পাথরে— ভাবলো তানিয়া মেয়েটা কবিতাভক্ত মানুষ, ওকে দেওয়া যাবে; খুব দামি কিছু কিনলে আবার ব্যাপারটা নাটকীয় হয়ে যাবে। কাজেই এই ধরনের ছিপছিপে একটা বইই ভালো! পাঁচটা তবু ঘড়িতে বাজেনি। হেঁটে হেঁটে আজিজ সুপার মার্কেট থেকে আবার গেলো পিজি হাসপাতালের নিচে, সিলভানা রেস্তোরাঁয় বসলো চা খেতে, চা খেয়েও সময় যায় না, আর রেস্তোরাঁটায় এতো ভিড় যে দুদণ্ড বসে জিরানোরও উপায় নেই। অগত্যা তাকে উঠতে হলো। তারপর মুশকিল যে, এখানে পত্রিকার দোকান দুটো— কোনটায় তানিয়া দাঁড়াতে বলেছে, কে জানে। সে নার্সিং হোমের বারান্দার উদ্বেগাকুল সম্ভাব্য পিতার মতোই একবার এ হকার আরেকবার ও হকার করতে লাগলো।

অবশেষে পাঁচটা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই দেখা মিললো তানিয়ার। তানিয়া রিকশা থেকে নামছে। সে নীল রঙের শাড়ি পরেছে। রিকশা থেকে এক পা নামাতে গিয়ে তার শাড়ি অনেকটা উঠে গেলে সুডৌল পা এমনভাবে ঝিলিক দিলো যেন কালো মেঘ চিরে ঝলসে উঠলো বিজলিরেখা। শামস কবিরের বুকের মধ্যে দুন্দুভি বাজছে প্রচণ্ড রবে। তানিয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলো শামস কবির।

ও আপনি এসে গেছেন, আমি ভেবেছি আসবেনই না— তানিয়া হাসলো। সেই মারাত্মক আণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন হাসি। আর শাড়িতে কী দেখাচ্ছে মেয়েটাকে! শাড়িতে তোমাকে সবচেয়ে ভালো লাগে এবং তা যদি স্বদেশের তাঁত হয়— রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর দুটো চরণ মনে এলো তার।

বেশ খানিকক্ষণ আগেই এসেছি— বললো শামস কবির।

কোথায় যাবেন?

আপনার ইচ্ছা।

আমার ইচ্ছা ? চলুন একটা আইসক্রিমের দোকানে যাই। আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করছে। আহ্লাদি শোনালো তানিয়ার গলা।

চলুন।

তানিয়া একটা রিকশা নিচ্ছে। ও বাবা। এক রিকশায় উঠতে হবে নাকি। শামস কবির ভাবলো। স্মার্ট হও শামসু মিয়া, দিনাজপুরের লিচুর মতো ছোটবিচি হয়ো না, বুকটা বড়ো করো। নিজেকে সাহস দিলো সে। তারপর ঠিকই এক রিকশায় একটা জলজ্যান্ত রূপবতী তরুণীকে পাশে বসিয়ে শামস কবির চললো আইসক্রিমের দোকানে।

আইসক্রিমের দোকানে অবশ্য এর আগে কখনো বসে নি সে। টেবিলে পড়ে থাকা মেনুতে দাম দেখে তার কলজেতে পানি এলো। যাক বিল শোধ করবার মতো টাকা তার মানিব্যাগে আছে।

মানিব্যাগটা আছে তো ? হিপ পকেটে হাত দিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেলো।

আইসক্রিমের অর্ডার দেওয়া হলে কম্পিত বক্ষে শামস কবির বললো, আচ্ছা, বলেন আপনার জরুরি কথা।

না, তেমন কিছু নয়।

তবে যে কাল বললেন ?

সেটা কোনো একটা নির্দিষ্ট কথা নয়। এই যে একসঙ্গে বসে আছি, গল্প করছি, এই-ই আর কী। আপনার কথা বলুন। আপনার কী ভালো লাগে, কী খারাপ।

আমি— আমি একটু পাগলাটে স্বভাবের মানুষ। কবিতা-টবিতা নিয়ে আছি। আপনার কী ভালো লাগে ?

আমার। আমার ভালো লাগে দেশের বাইরের পৃথিবীটা দেখতে। জানেন, যখন শুনেছি আপনার পুরো ফ্যামিলি ইউএসএতে থাকে, তখনই আমি আপনার দারুণ ফ্যান হয়ে গেছি। আপনিও তো চলে যাবেন, তাই না। আই এম রিয়েলি জেলাস।

শামস কবিরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ও, তাহলে এই কথা! তার পরিবারের লোকজন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে থাকে এই তাহলে এ মেয়েটির কাছে তার একমাত্র যোগ্যতা। তার কবিতা-টবিতা কিছু নয়। তার কাছে সবকিছু মনে হলো তেতো, কটু। সে বললো, শোনেন, আমার একটা জরুরি কাজ আছে, আজ একটু উঠতে হবে।

ওমা। জরুরি কাজ আবার কী ?

আর শুনুন। আমার অফিসে আর ফোন করবেন না। বস রাগারাগি করেন।

তাহলে আপনার বাসার ঠিকানা দিন। দেখবেন এক ছুটির দিন সারা দিন আপনার সঙ্গে কাটিয়ে দেবো। ব্যাচেলরদের ঘরদোর খুব এলোমেলো হয়। আমি খুব সুন্দর ঘর গোছাতে পারি।

নাহ। তা করতে যাবেন না। বাসাওয়ালি খুব বদরাগী। আর কুকুর পোষেন। বাইরের কেউ গেলেই কুকুর লেলিয়ে দেন। আর ব্যাচেলরের ঘরে মেয়ে... এই বিলটা দিন তো।

তানিয়া-পর্বের সমাপ্তি ছিল ওখানেই। ওই মেয়ে তার সঙ্গে এরপরেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে দু'একবার। শামস কবির কঠোরভাবে তাকে এড়িয়ে গেছে। শামস কবিরের জীবনে দুটো অপাওয়া আছে। এক. রমণীর প্রেম, দুই. কবি হিসেবে স্বীকৃতি। সে কবিতা লেখে, সর্বস্ব পণ করে সে হয়ে উঠতে চায় কবি। তার একটা-দুটো কবিতা এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেরোয়ও। কিন্তু তার চারপাশ তাকে কবি বলে স্বীকার করে না, তার সঙ্গে কবিজনোচিত ব্যবহার করে না। আসলে তার জীবনের প্রথম অপাওয়াটা এসেছে দ্বিতীয় অপাওয়া থেকে। তার আত্মীয়বর্গ আমেরিকায় স্থায়ী— এ পরিচয়টা ব্যবহার করে সে যে কেবল দুচারটা প্রেম করতে পারতো তাই নয়, দুচারটা গর্ভপাতের কারণ হতে পারতো হয়তো, কিন্তু সে ভালোবাসতে চায়, প্রেমে পড়তে চায়, দরকার হলে প্রেমে ব্যর্থ হতে চায়— শুধু কবিতার জন্য। এ কথাটা কাউকে বলা যায় না আর বললেই বা বুঝবেটা কে।

জীবনের আঠাশটি বছর যা পায়নি, আজ কি তাই সে পেতে যাচ্ছে, এভাবে। এক অসামান্য নারীর কাছ থেকে সে পেতে যাচ্ছে কবির স্বীকৃতি, এক অপূর্ব নারী তার পাঠিকা হিসেবে নিজেকে জাহির করে শামস কবিরকে দিতে যাচ্ছে দেবতার সম্মান।

কবিদের জীবনে নারীদের অবদান যে অসামান্য এটা শামস কবির খুব বেশি বিশ্বাস করে। সব বিদেশী ধ্রুপদী কবিদের, রোমান্টিক কবিদের জীবনে কবিতা ও ভালোবাসা ছিল অভিন্ন ব্যাপার। কি রবীন্দ্রনাথ, কি শামসুর রাহমান— কবিদের কাব্যের অফুরন্ত প্রেরণা হলো নারী।

কিন্তু কবির নারী কি যেমন-তেমন হলে চলে? আল মাহমুদ যেমনটা লিখেছিলেন— ও পাড়ার রূপসী রোজেনা, সারা অঙ্গে ঢেউ তার তবু মেয়ে কবিতা বোঝে না— এরকম মেয়ে আবার কবির নারী হয় নাকি? জীবনানন্দ দাশ কি আর সাধে দুঃখ করে গেছেন—

একবার বেদনার পানে চেয়ে— এক নক্ষত্রের পানে
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেলো যুবকের দল;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা; —এইসব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি : তবু আহা, ইহাদেরি কানে...

বাথরুম থেকে ভেজা কাপড়-চোপড়ে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢোকে শামস কবির। জুতা খোলে, জামা খোলে, ট্রাউজার— পানিতে সমস্ত মেঝে ভিজে যায়, কাজের ক্রম ভুল হতে থাকে। দেয়ালে ঝোলানো ছোট্ট আয়নায় নিজের মুখ দেখে ভেংচি কাটে, তারপর খুশি মনে বলে, শামস কবির, এতোদিনে তোমার জীবনে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত নারী, কবিতার নারী, কাব্যের নারী— যার জন্য তুমি অর্বুদ বছর অপেক্ষা করেছো, যে তোমার কবিতা পড়ে, মুখস্থ করে, আর তোমাকে ফোন করে জানায়।

অস্থির লাগে। বড়ো অস্থির লাগে শামস কবিরের। সে ভেজা শরীরে খালি গায়ে বিছানায় বসে। ঘরে টেবিল নেই, কিন্তু কবিতা লিখতে টেবিল লাগে না। তার কবিতা লেখার

খাতা বের করে, আস্তে আস্তে লিখতে থাকে—

নীল ফুল ফুটে রয় কোন সে বাগানে
বালিকা কি জানে
প্রীত আলো নাকি জল হৃদয়-উঠানে
ওই দুটো চোখ তার আনে।
কতোটুকু অন্ধকার বনলতা চুল তার আনে কোন গাছের গোড়ায়
বালিকা জানে না হায়, এতোটুকু না পুড়েই
সে আমাকে কতোটা পোড়ায়!

নাহ! ঠিক হলো না। লেখা কবিতাটা সে ছিঁড়ে ফেললো। তার ভেতরে কিসের যেন দপদপানি... কখন সে অফিস যাবে, কখন বাজবে সেই টেলিফোন, কখন কথা কয়ে উঠবে সেই কিন্নরকণ্ঠ, শোনাবে কবিতার কথা।

মা যেদিন নিউইয়র্কের উদ্দেশে বিমানের ফ্লাইটটিতে উঠে পড়েন, সত্যি কথা বলতে কি, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি শামস কবির।

অথচ ফেলা উচিত ছিল, মা তিনি তো অন্য কোনো কিছু না হলেও জননী, গর্ভধারিণী। দশটি মাস কী কষ্টই না সইতে হয় একেকজন মাকে। তারপর? মানবশিশুর মতো অসহায়ত্ব নিয়ে কে আর আসে পৃথিবীতে। ওই সময় একেকটা মানুষের বাচ্চা যে বেঁচে থাকে, তার মূলে আছে এক আশ্চর্য রসায়ন— স্নেহ, স্নেহের নিম্নগামিতা। কোত্থেকে এতো স্নেহধারা এসে জমে মায়ের হৃদয়ে। দিন নেই, রাত নেই— এক শিশুসন্তানের জন্য মা কী না করেন।

কিন্তু সন্তানেরা তার বদলে মাকে যা দেয়, তার নাম উপেক্ষা, অবজ্ঞা আর বঞ্চনা। ভাগ্যিস মায়েরা প্রতিদানের আশায় কিছু করে না। ওই শিশুটি যখন বড়ো হয়, বাবা হয়, মা হয়, তখন তার সন্তানের জন্য সে আবার সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়।

এ নিয়মের মধ্যেও কিন্তু উনিশ-বিশ থাকে। যেমন শামস কবিরের বড়ো দুই ভাই যথেষ্ট মাতৃভক্ত। প্রবাসে তারা কী রকম ভালো করছে, আমেরিকানদের স্কলারশিপের টাকায় পড়ে এখন কেমন আমেরিকানদের কাছ থেকেই আদায় করছে মোটা অঙ্কের বেতন— সেটা মাকে দেখানো জরুরি। তার ওপর বড়ো ভাবির জমজ বাচ্চা হয়েছে, দুটো নাতি একসঙ্গে দর্শনের আকুলতাও তো মার প্রখর। সুতরাং মা চললেন মার্কিন মুলুকে।

তাহলে দেশে শামস কবিরের রইলোটা কী? ও যে একা পড়ে যাবে। মা কাঁদেন— শামসু

হাজার হলেও আমার ছোট ছেলে। ছোট ছেলের প্রতি বাবা-মার এক ধরনের স্নেহান্ধতা থাকেই।

ভাইয়েরা চিঠি লেখে, শামসুকে বলো টোয়েফ্‌ল জিআরই দিতে। ওর কি ব্রেন কম নাকি ? ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে শামসুই সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট। যেসব কঠিন পাজল আমরা কেউ সল্‌ভ করতে পারতাম না, শামসু সেটা করে ফেলতো দুমিনিটেই। আরেকবার, তোমার মনে আছে মা, নজরুলের কবিতার অনুবাদ কে একজন পণ্ডিত করেছিল, মৌ-লোভী যতো মৌলবীদলে– দি মৌলবিস অ্যান্ড মওলানাস, তা দেখে ক্লাস সেভেনের শামসু বলেছিল, ওটা তো হবে 'হানি-গ্রিডি মৌলবিস'। ওকে বলো, দেশে থেকে নিজেকে নষ্ট করার মানে হয় না। বাংলা সাহিত্যে এমএ করে কী করবে ? কলেজের টিচার হবে। আব্বাকে দেখেনি সারা জীবন, কী কষ্টটা করলো!

মা বকবক করতেন, শামসু, বড় ভাইয়েরা কী বলে, একটু শোনটোন। তোর ভালোর জন্যই তো বলে।

শামসু মায়ের কথায় পাত্তা দেয় না। মায়ের উপরে তার খুবই নগণ্য কারণে একটা রাগ রয়ে গেছে। সেবার সাপ্তাহিক বিচিত্রায় তার একটা কবিতা ছাপা হয়েছিল। সে তখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে। উত্তেজিত হয়ে সে দুই কপি বিচিত্রা কিনে নিয়ে চললো দিনাজপুরে। নাইট কোচে সারা রাত জেগে ধকল সয়ে সকালবেলা গিয়ে পৌঁছলো দিনাজপুর।

মা মা— রিকশায় বসা শামসু গেটের বাইরে থেকে চিৎকার পাড়ছে।

মা রুটি বেলছিল। তার দুহাতে আটা লেগে আছে। মিষ্টি হাসি নিয়ে যেন ফুটছে সেদিনের সেই নরম পবিত্র সকালটি যেন। বেরিয়ে এলো।

বাবা শামসু! হঠাৎ। আয়।

ঘটনা আছে। দাঁড়াও। দেখছি। শামসু রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে।

বাসার ভিতরে গিয়ে মার জিজ্ঞাসা— কী ঘটনা বলবি। বল তো।

মা, আমার কবিতা ছাপা হয়েছে। সাপ্তাহিক বিচিত্রায়।

বাহ। খুব খুশির কথা। মা বললো।

ততোক্ষণে শামসু একটা বিচিত্রা বের করে দিয়েছে মায়ের হাতে। মা কবিতার বাঁপাশের বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে বললো, বিচিত্রায় কবিতা ছাপা হয়েছে, কতো টাকা পাবিরে শামসু।

ব্যস। মুখ অন্ধকার হয়ে গেলো শামসুর। এই যে অভিমান, এটা সে কোনোদিনও ভুলতে পারেনি। মাকে বলেওনি কিছু।

শুধু তার বাবার স্মৃতি মনে পড়ে।

তার কলেজ শিক্ষক ভালো মানুষ বাবাটা এভাবে মরে গেলো। সে শেষ দেখাটা দেখতে পারলো না পর্যন্ত। তার তখন অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। বাবার অসুখ, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, জানানো হয়নি তাকে। শেষে যখন বাবা মারাই গেছে, তারপর তাকে জানানো হলো— ফাদার সিরিয়াস। কাম শার্প। সেদিন ছিল হরতাল। বাস-ট্রাক বন্ধ।

একমাত্র ভরসা ট্রেন। একতা এক্সপ্রেস। একতায় বিকাল তিনটায় উঠলো। পরদিন সকালে পৌছার কথা। হরতাল বলে সবকিছু এলোমেলো। শামসু গিয়ে পৌছলো পরদিন সন্ধ্যায়। সে তো জানতো, বাবা অলরেডি গন। সারারাত সে ট্রেনের সিটে বসে কেঁদেছে।

তার বাবা ছিল এক আশ্চর্য মানুষ। তার ট্রাঙ্কের ভেতরে পাওয়া গেছে দুটো উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। বাবা লিখতো সেটাই সে জানতো না। তবে সাহিত্যের ক্ষুধাটা বাবাই উস্কে দিয়েছিল শামসুর ভেতরে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট বাবা সব সময় গল্প করতো শেক্সপিয়রের সাহিত্যের। মার্চেন্ট অফ ভেনিসের সেই বিখ্যাত বাগ-কৌশল— হৃৎপিণ্ড কেটে নিতে পারো, কিন্তু একফোঁটা রক্ত যেন না পড়ে— খুব প্রিয় ছিল বাবার। বারবার একই গল্প করতো বাবা। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে।

বাবা যদি বেঁচে থাকতো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শামস কবির। বাবা হয়তো বুঝতো তার এই অব্যক্ত বেদনা— কবিতার কামড়ে কী করে একজন যুবক অস্থির হয়ে ওঠে, বুঝতো— একজন মানুষ এ সমাজে থাকা সম্ভব, যার কাছে শেয়ার মার্কেটের দরপতন নয়, স্টেডিয়ামের উইকেট পতন নয়, এমনকি মন্ত্রিসভার পতনও নয়, কেবল একটি পঙক্তির ছন্দপতন রোধই বেশি জরুরি বলে মনে হতে পারে।

চলে যাওয়ার আগে অবশ্য মা খুব কেঁদেছিলেন। এই এত্তোবড়ো দেশটায় তুই বড়ো একলা হয়ে গেলিরে শামসু। ঢাকায় তো আত্মীয়স্বজনও আছে, তাদের বাড়িতেও তো যাস না। কী যে তোর ভালো লাগে, কী খারাপ, কীসে তুই খুশি হোস, কীসে অখুশি— আমি মা হয়েই ধরতে পারলাম না, আর অন্যরা কেমন করে বুঝবে। ছোটবেলায় কিন্তু তুই এমন ছিলি না। বুকের সাথে লেপ্টে থেকে ঘুমোতি। তোকে ভাত খাওয়াতাম পেট ভরায়ে। ছোটখাটো একটা ধামার মতো গোল পেট ছিল তোর। লোকমা লোকমা করে ভাত সাজিয়ে রাখতাম। তারপর বলতাম, এটা হলো তোর বাবার বখরা, খা। এটা তোর বড় ভাইজানের। এটা মেজোর। তুই খেতি। তারপর কাঁসার গেলাসে এক গেলাস পানি খেয়ে বলতি, মা, পেট কি ভরেছে ? আরে বাবা, তোর পেট, তুই বোঝ। উল্টো তুই আমাকেই জিজ্ঞেস করতি। সেই ছেলে বড়ো হতে হতে কেমন অচেনা হয়ে গেলি। আমেরিকায় গেলে কি আর আমার ফেরা হবে শামসু। এই দেশে তুই তো একলা। একটা বিয়ে-থা করে নিস। অন্তত শ্বশুর-শাশুড়িরা তো থাকবে। আপদে-বিপদে সহায় হতে পারবে।

শামসু জানতো, মায়ের এ চলে যাওয়া মানে চিরবিচ্ছেদ। মা আর ফিরছে না। তেমনি শামসুও কোনোদিন আমেরিকান অ্যাম্বাসির লাইনে দাঁড়াচ্ছে না ভিসার জন্য।

বিমানবন্দরে বিমানের কাউন্টারে রিপোর্ট করে মা ঢুকে যাচ্ছে কাচঘেরা ঘরে। যাবার আগে বার বার ফিরে তাকাচ্ছে। শেষে আবার এলো ফিরে— শামসু, চিঠি লিখিস। ঢাকায় একটা ফোন নে। ফোনে তো কথা বলা যাবে। ফটো পাঠাস। আর টোয়েফল না কী বলে দে পরীক্ষাটা! চলে আয় তাড়াতাড়ি। যাইরে।

যাই বলে মা দাঁড়িয়ে পড়লো। এখন কান্না শুরু হবে। অযথা সিনক্রিয়েট হবে। শামসু কড়া গলায় বললো, মা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। যাও, ভিতরে যাও।

মা অন্তর্ধান করলো। শামসু একটা ভেজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, আহ। বুকটা তার হাল্কা হয়ে গেলো। এই দেশটাতে সে এখন সম্পূর্ণ নির্ভার— সম্পূর্ণ স্বাধীন, একা।

একজন কবির জন্য তো এই একাকীত্বই চাই। এই পিছুটানহীনতা।

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?
আমার পথেই শুধু বাধা ?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে,
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে— জন্ম দেবে ব'লে
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি ? তাহাদের মন
আমার মনের মতো নাকি ?—
তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী !

বিমানবন্দর থেকে একটা বেবিট্যাক্সিতে ফিরছে শামস কবির। তার মাথার মধ্যে স্কুটারের আওয়াজের সঙ্গে তাল দিয়ে বেজে চলেছে— তবু কেন এমন একাকী ? তবু আমি এমন একাকী।

আমি একা। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে একবিন্দুর মতো আমি একা। একা এবং স্বতন্ত্র। কারণ আমার ডানা আছে। আমি উড়তে পারি। আমার আছে নিজস্ব আকাশ। কবির আকাশ। শব্দ আমাকে ভাঙে, গড়ে, তুলোর মতো ধোনে, ছন্দ আমাকে দোলায়, তরঙ্গের উপরে তুলে আছড়ে মারে। আমি এই দেশ ছেড়ে কোথায় যাবো ? আমার ভাষা বাংলা, আর বাংলাভাষীরা সব এইখানেই যে ঠাঁই গেড়েছে। এরই মধ্যে আমার বেঁচে থাকতে হবে। নইলে যে একদিন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো পস্তাতে হবে। হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব অযুত রতন, তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা কবি পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি...।

নয়ন ভাই এখনো অফিসে আসেননি। দুটো ফোন, দুটোই এনগেজড। একটা কোলে তুলেছে কায়সার। সে এখন নানা জায়গায় ফোন করবে। দরকারি ফোন, অদরকারি ফোন। পকেট থেকে তার টেলিফোন নাম্বারের বইটা সে বের করেছে। 'এ' দিয়ে সে শুরু করলো। 'জেড' দিয়ে শেষ হবে ব্যাপারটা। হয়তো শেষ হবেও না, যদি না নয়ন ভাই অফিসে চলে আসেন। 'এ' দিয়ে সে নিশ্চয় প্রথম অন্তরাকে ফোন করেছে। মডেল অন্তরা হক। নাম শুনে তাকে কোনো তন্বী তরুণী মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। তিনি একজন অশীতিপর বৃদ্ধা। একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য স্থিরচিত্রে একবার মডেল হয়েছিলেন। কায়সার তার সঙ্গেও কথা বলবে। কেমন আছেন দিদিমা ? বাতের ব্যথাটা কমলো ? এক কাজ করে দেখবেন, নিমপাতার হাওয়া লাগিয়ে দেখবেন। নিমপাতা নাকি সর্বরোগহর। কেমন করে যে মানুষ ফোনে এতো কথা বলতে পারে।

শামস কবির বিস্মিত, বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন।

দুটো ফোনই এনগেজড হয়ে থাকলে তার ফোনটা আসবে কীভাবে ? তার সেই কাঙ্ক্ষিত ফোনটা। একটা জীবন সে যে একটা ফোনের জন্য অপেক্ষা করছে।

আর দ্যাখো, রসিক সরকারকে। নিজের গ্রামের বাড়িতে ফোন করেছে। লোকটা বউ-বাচ্চা ফেলে রেখেছে গ্রামের বাড়িতে। ঢাকায় থাকে একটা মেসে। অদ্ভুত লোক। 'তপুর মা, কী রানলা। লাউ। অসময়ে লাউ পাইলা কই ? শক্ত লাউ কচকচ করবো না ? হাঁপানির টান কেমুন। তোমারে না কইছি ধুলাবালির মইদ্যে বারাইবা না। বারাইছিলা।'

রসিক সরকার কি ফোনটা রাখবেন ? নাকি বলবে, রসিক ভাই, নয়ন ভাই ফোন করবেন, ফোন রাখেন। মিথ্যা বললে সুফল ফলতে পারে। আবার ধরা খাওয়ারও চান্স আছে। যদি বলে, নয়ন ভাই তো এখন ফ্লাইটে। ফোন করবে কোথেকে।

নাহ। কিছু বলতে হলো না। রসিক সরকার নিজেই ফোন রেখে দিলেন। একটা টুথব্রাশ বের করলেন পকেট থেকে। পিয়ন ফরিদ এনে দিলো একটা মিনিপ্যাক টুথপেস্ট। বাসায় পানি নাই, দাঁতটা পর্যন্ত মাজতে পারি নাই— রসিক সরকার বললেন। যাক বাবা, বাঁচা গেলো। বাথরুমে নিশ্চয় খানিকটা সময় তিনি কাটাবেন।

ফরিদ, অ্যাই ফরিদ, অফিসের গেটটা লক কর। রসিক সরকার চিল্লানি দিলেন। ফরিদ বাইরের গেটটা লক করলো। রসিক সরকার বললেন, বাথরুমে প্যান্ট পরে গেলে প্যান্টের পা দুটা ভিজে যাবে। খুলেই যাই। তিনি অবলীলায় প্যান্ট খুলে ফেললেন। গায়ের শার্টটা লম্বা বলে পরিস্থিতিটা ভয়াবহ দেখাচ্ছে না। শামসু, তোমার স্যান্ডেলগুলো দাও তো, জুতা পরে তো আর বাথরুম সারা যায় না— রসিক সরকারের যুক্তি অকাট্য। শামস কবির তার স্যান্ডেল জোড়া খুলে দিলো। রসিক সরকার বাথরুমে ঢুকে পড়লেন।

কিন্তু ফোন তো আসে না। মাঝে মধ্যেই রিং বাজে, দৌড়ে গিয়ে ধরে শামস কবির, কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত ফোন আর আসে না। শরীরটা নিস্তেজ হয়ে আসে শামস কবিরের। তাই তো! এমন তো কথা ছিল না যে, আজই ফোন আসবে, এখনই ফোন আসবে। কিংবা কখনো যে আসবে তারই বা কী গ্যারান্টি? একটা ফোন পেয়ে সামান্য কিছু বাক্য বিনিময় করেই কেন শামস কবির তা নিয়ে অতিরিক্ত রক্তাক্ত হচ্ছে। তার বাস্তববুদ্ধি তো লোপ পেয়ে গেছে।

তাই হয়তো হবে। কিন্তু তার জন্য কি তাকে দোষ দেওয়া যায়? শামস কবিরকে। সে তো এমনই একটা টেলিফোনের জন্য একটা জীবন ধরে নিজেকে বিনিয়োগ করেছে। একটা নারীকণ্ঠ, একটা নারীসত্তা, যে ঠিক সাংসারিক নারী নয়, শিল্পের নারী। সে তো একটা স্বীকৃতির জন্যই গোপনে দিনের পর দিন লালায়িত— তার কবিত্বের স্বীকৃতি। সারাটা জগতের জানবার দরকার নেই, একটা কিন্নরসত্তা জানুক— সে কবি। এ জগতে একজন থাকুক— যার সঙ্গে সে কথা বলবে কবির মর্যাদাটুকুন নিয়ে। একটা ভালো কবিতা বিষয়ে আলাপই হবে তাদের একবেলার আহার, শামস কবিরের দৈহিক সৌন্দর্য নয়, সামাজিক প্রতিপত্তি নয়, আমেরিকায় যাওয়ার সম্ভাবনা নয়— তার হৃদয়ের ভেতরে থাকা ব্যথিত নিঃসঙ্গ কবিসত্তাটিকেই যে মূল্যবান জ্ঞান করবে। কবি রফিক আজাদের ভাষায়—

এমন কাউকে খুঁজি
যে হবে আমার
বোধের অংশীদার;

এমন কাউকে খুঁজি
যার চোখ দেবে
কর্মে প্রবর্তনা;

এমন কাউকে খুঁজি
যার মুখ চেয়ে
জীবনকে আগলাবো;

এমন কাউকে খুঁজি
যে বাড়াবে তার
কম্পিত ঠোঁট-জোড়া;

এমন কাউকে খুঁজি
যার হাত ধরে
শিল্পে সাহস পাবো॥ .

নয়ন ভাই চলে এসেছেন অফিসে। তার ড্রাইভার যথারীতি আগে আগে এলো হটপট নিয়ে। তার চেম্বারে ঢোকার আগেই তিনি দেখতে পেলেন জুতা আর গন্ধময় মোজা ছড়ানো, একটা প্যান্টও— ওল্টানো। তার ভ্রু কুঁচকে গেলো।

এই কবির, অফিসের এ কী অবস্থা, রসিদ ভাই কই ?

বাথরুমে। তার বাসায় পানি নেই তো!

প্যান্ট কার ?

রসিদ ভাইয়ের।

সরিয়ে রাখো। নয়ন ভাই বললেন।

পিয়ন ফরিদ প্যান্টটা একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলো।

খানিক পর বেরোলেন রসিক সরকার। বেরিয়েই জিভ কাটলেন লজ্জায়। অফিসে বস এসে গেছেন। অথচ এ সময় তার আসার কথা নয়। সর্বনাশ। এই আমার প্যান্টটা কই। তিনি ফের বাথরুমে ঢুকলেন। ফরিদ তার প্যান্ট বাথরুমে দিয়ে এলো।

প্যান্ট পরে তিনি বেরোলেন। পুরোটাই প্রায় ভেজা। বোধহয় বাথরুমের ভিজে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল। আর প্যান্টটার কাপড়টাও এমন যে, পানির ছোপ ছোপ দাগ অত্যন্ত প্রকট হয়ে আছে।

নয়ন চৌধুরী বললেন, কবির। এই ভদ্রলোককে নিয়ে তো বেরনো যাবে না। কালকের কোটেশনটা জমা দিতে হবে। চলো, এক জায়গায় যাই।

শামস কবিরের চোখমুখ অন্ধকার হয়ে এলো। এখন যদি সেই ফোনটা আসে। কী আর করা। উর্ধ্বতনের নির্দেশ। যেতেই হবে।

নয়ন চৌধুরীর টয়োটা করোলায় তাকে উঠে বসতে হলো। ড্রাইভার বললো, স্যার, ভাত খাইবেন না। ভাবি আমারে কইয়া দিছে সংগে কইরা দেওনের কথা।

গরম উষ্ণ ভাত। হটপটে। একজন নারীর এই তো নিত্যদিনের শিল্পকর্ম। তারও ভোক্তা আছে নির্দিষ্ট কয়জন। কী জানি, শিল্পের ভোক্তা হতে গেলে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়, বোদ্ধা হতে হয়। এই পুরুষেরা তা বোঝে কিনা! মন দিয়ে গরম ভাত খেতে জানে, নাকি শুধু পেট দিয়ে খায় ? খাওয়ানোর পর নারীটি যে অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রত্যাশা করে পুরুষের কাছ থেকে, তা কি সে পায় ?

কবিতার মতোই এ যে দেখছি বঙ্কুর সর্পিল পথ— শিল্পের পথ। শিল্পীর পথ। রন্ধনশিল্পীও শিল্পী, শব্দশিল্পীও শিল্পী।

সেদিন তারা মধ্যাহ্নভোজ সারলো একটা রেস্তোরাঁয়। ক্যালেন্ডারের কাজ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ কর্মকর্তাও ছিল সেখানে। শামস কবিরের মনটা পড়ে রইলো হটপটের ভেতরে, যেখানে গরম শাদা ভাত ধোঁয়া ছড়াচ্ছে.. তাপ ছড়াচ্ছে.. আজ যদি সে ফোন করে... আজ যদি...

অফিসে ফিরতে ফিরতে শামস কবিরদের পাঁচটা বাজলো। নয়ন ভাই আর উপরে উঠলেন না। বললেন, কবির, উপরে উঠে হটপটের ভেতরে টিফিন-ক্যারিয়ারটা খালি করবে। ফরিদকে বলো না হয়, খেয়ে নেবে। তারপর ওটা তাড়াতাড়ি করে পাঠিয়ে দাও গাড়িতে।

অফিসে এসে শামস কবির জিজ্ঞেস করলো, এই আমার কোনো ফোন এসেছিল নাকি ? একটা জরুরি কল আসার কথা ছিল।

কায়সার বললো, ভালো কথা মনে করছেন তো শামস ভাই, বহুক্ষণ ফোন করা হয় না।

আরে আমি জিজ্ঞেস করি, আমার কি কোনো ফোন এসেছিল।

না।

রসিক ভাই, আমার কোনো ফোন এসেছিল?

না।

ও। এই ফরিদ। নয়ন ভাইয়ের হটপটের খাবার ঢেলে খালি করে এক্ষুণি নিচে দিয়ে আসো। নয়ন ভাই নিচে গাড়িতে বসে আছেন। দৌড় দৌড়।

পিয়ন ফরিদ কাজে লেগে গেলো। একবার শুধু মিনমিনে গলায় জিজ্ঞেস করলো, স্যার, খাবারগুলো কী করবো?

আগে হটপট দিয়ে আসো। তারপর খেয়ে নিও।

ফরিদ খাবার ঢাললো। অফিসের কারো প্লেটে। সফরি লেবুর দুটো টুকরো ছিল টিফিন ক্যারিয়ারের উপরে। গন্ধে পুরো অফিস মৌ মৌ করে উঠলো।

তাড়াতাড়ি যাও ফরিদ। নয়ন ভাই বিরক্ত হবেন— শামস কবির আবার তাগাদা দিলো। ফরিদ বেরিয়ে গেলো দ্রুত পায়ে।

বাহবা, বসতো রোজ দারুণ খাবার খায়— রসিক সরকার এগিয়ে এলেন তার রসনা শাণিয়ে। এটা কী মাছ? রুই? দেখতে বেশ হয়েছে। তিনি মাছের টুকরাটা ভেঙে মুখে পুরলেন। বাহবা, খেতেও তো বেশ লাগছে! ভাবি তো ভালোই রাঁধেন। ঝোল দিয়ে মেখে একটু ভাত খাওয়া যাক। তিনি ভাত তরকারি মাখতে লাগলেন।

ফরিদ এলো একটু পর। হন্তদন্ত হয়ে এসেই তার মনে একটা বড় আঘাত লাগলো। অফিস-ম্যানেজার স্যার তার বখরার ভাত খেয়ে ফেলছে। সে ঢোক গিললো।

শামস কবির বসে আছে তার টেবিলে। কম্পিউটারটা অন করলো— অকারণে, সে একটা গেম বের করলো। গাড়ি চালানোর খেলা। আমেরিকার হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে। উভয় দিক থেকে গাড়ি আসছে। তাদের সাইড দিতে হবে। মাঝে মধ্যেই পাহাড়ি পথ, বিপজ্জনক বাঁক। বেশি জোরে চালালে আবার পুলিশ কার এসে ফাইন নেয়। গ্যাস স্টেশন থেকে জ্বালানি না নিলেও বিপদ। তবে একটা জিনিস খুব ভালো। একেকবার খেলায় তিনবার করে এক্সিডেন্ট করা যায়। এই যে এক্সিডেন্ট করলেও মৃত্যু নেই— জীবনের দৌড়ে যদি এই খেলাটি থাকতো।

খেলায় শামস কবিরের মন বসছে না। অমনোযোগিতার কারণে সে বার বার এক্সিডেন্ট করছে।

তার মন আসলে পড়ে আছে টেলিফোনের দিকে। আহা, সেই বিশেষ ফোনটা কি আর আসবে না। কোনোদিনও না।

গঁ গঁ— ভীষণ শব্দ উঠছে ও টেবিল থেকে। ব্যাপার কী? ব্যাপার আর কিছুই নয়। প্রকৃতির প্রতিশোধ। মাছের কাঁটা রসিক সরকারের গলায় আটকে গেছে। তিনি নানা ধরনের কসরত করছেন কাঁটা বের করার।

নিজের সিটে বসে শামস কবির আপন মনেই হাসলো। তবে ফরিদকে মনে হচ্ছে খুব

সিরিয়াস। সে বলছে, স্যার, গরম ভাতের দলা খাইতে হইব। হোটেল থাইকা এক প্লেট ভাত কিইনা আনি স্যার।

নাহ। অফিসে আর ভালো লাগছে না। সাড়ে পাঁচটা বাজে। আজ আর কাজ নেই। এতোক্ষণ অফিসে থাকার কোনো মানে হয় না। শুধু ফোনের জন্য থাকা। শামস কবিরের বাসায় তো ফোন নেই। তবে মেয়েটা যদি আরেকবার ফোন করে, তবে বলা যায় না, যতো টাকা লাগুক, সে একটা চেষ্টা নেবে বাসায় ফোন লাগানোর। বাসায় ফোন থাকলে কথা বলা যাবে— স্বাধীনভাবে, অকুণ্ঠচিত্তে। অফিসের ফোনে কথা বলা মানে তো একটা চোর চোর ভাব দেখানো।

রসিক সরকার গলায় হাত দিয়ে চেষ্টা করছেন কাঁটা বের করার। বেরোচ্ছে না। তিনি একবার বাথরুমে যাচ্ছেন, একবার নিজের টেবিলে ফিরছেন। নিজের চেয়ারে বসে গলার ভেতরে আঙুল দিয়ে বোধহয় কাঁটাটা ধরে ফেলেছেন। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গল গল করে বমি বেরিয়ে এলো। তার টেবিলের কাছে সদ্যভুক্ত ভাত মাছ সব হলুদ-শাদা রঙ ছড়িয়ে চেয়ে আছে।

শামস কবির মহাবিরক্তি ভরে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।



নয়ন ভাই দেশের বাইরে। অফিসে তাই অপার স্বাধীনতা। রসিক সরকারের সর্দি লেগেছে। তিনি কাপের মধ্যে ব্রান্ডিতে গরম পানি মেশাচ্ছেন। তারপর বোতলটা ড্রয়ারে রেখে এমনভাবে কাপে চুমুক দিচ্ছেন যেন চা খাচ্ছেন। বুঝলে শামসু, সর্দির মেডিসিন খাচ্ছি। মেডিসিন খাওয়ায় কোনো দোষ নাই। ডাক্তার দিনে তিনবার খেতে বলেছে।

আপনার কাশি আছে রসিদ ভাই? কায়সার জিজ্ঞেস করলো।

আছে একটু। গলার ভেতরে।

তাইলে ডাইল খান।

তুমি কি আমার সাথে ইয়ার্কি করছো?

না রসিদ ভাই। আপনি জানেন আমি সিলেট মেডিক্যালে দু'বছর পড়েছি।

দুই বছরে কি ডাক্তার হয়ে গেছো?

না। মানুষের ডাক্তার হতে পারি নাই। গরু-ছাগলের প্রেসক্রিপশন করতে পারি।

কায়সার। তুমি কি আমাকে গরু-ছাগল বললা?

কী যে বলেন রসিদ ভাই। আপনি আমার বস।

বলতে পারো। তোমাদের মতো শুয়োরের বাচ্চাদের তো কথাবার্তার ঠিক নাই।

রসিদ ভাই। আমি কিন্তু এবার একটা কাণ্ড করবো। আপনাকে বেঁধে সব কাপড়-চোপড় খুলে নেবো। তারপর বাইরের পিলারের সাথে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেবো।

এই শুয়োরের বাচ্চা কী বলিস? রসিদ ভাই কায়সারকে মারতে গেলেন। তার হাতের পেপারওয়েট নিক্ষেপ করলেন। সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

শামস কবির রসিক সরকারকে ধরলো। আরে করেন কী করেন কী, ঠাণ্ডা হন। এই কায়সার...।

রসিক সরকার গোঁ গোঁ করছেন, কী ভাবছো, ওই শালা। বসের ভাইগনা হইছো বইলা আমগো ইজ্জত নাই। করুম না হালার চাকরি। আর আইজ খুন কইরা ছাড়ুম।

কায়সার বললো, রসিক মিয়া। আমি কিন্তু এক কথার মানুষ। আইজকা যদি তোমার স্টোমাক আমি পুলিশ দিয়া ওয়াশ না করাইছি, আমি হালায় মাইনসের পোলাই না।

শামস কবির মহাবিব্রত। ঝগড়াঝাঁটি মারামারির মধ্যে পড়লে তার নিজেকে ভারি অসহায় লাগে। এ অবস্থায় তার কী করা উচিত। সে রসিক সরকারকে ধরে রইলো।

কায়সার তার টেবিলের উপর বসে আছে। রাগে তার রোয়া ফুলে উঠেছে। আশ্চর্য, কায়সারকে মনে হচ্ছে একটা যুদ্ধংদেহী বিড়াল। একেবারে বেড়ালের মতোই তার ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে। সে এবার রসিক সরকারের দিকে তাকালো। তাকে দেখাচ্ছে ভেজা বেড়ালের মতো।

মানুষের মধ্যে বিড়াল স্বভাব আবিষ্কার করতে পেরে শামস কবির নিজেই অভিভূত হয়ে পড়লো। রসিক সরকার আবার ড্রয়ার খুললেন। ব্রান্ডির বোতল বের করলেন। কাপে ঢাললেন।

কায়সার টেলিফোনের ব্লু-বুকটা খুঁজছে। সে বললো, শামস ভাই, আপনি মতিঝিল থানার নাম্বার জানেন।

শামস কবির বললো, না, জানি না।

দাঁড়ান। বের করে ফেলছি। এক্ষুণি থানায় ফোন করে যদি পুলিশ না আনাই। মতিঝিল থানার ওসি আমার খালু হয়।

শামস কবির বললো, কায়সার। তুমি কি দয়া করে একটু চুপ করতে পারো। প্লিজ...।

ঝগড়াঝাঁটি হৈচৈ হাঙ্গামার ঠিক এই পর্যায়ে এলো একটা টেলিফোন। শামস কবিরকেই ধরতে হলো। হ্যালো— একটু যেন বিরক্তিভরেই সে বললো।

হ্যালো। শামস কবির আছেন?

জি... জি... বলছি...।

আমি আবার আপনাকে বিরক্ত করছি।

না না। বিরক্তির কিছু নেই।

আমাকে চিনতে পেরেছেন তো?

হ্যাঁ— টেলিফোনটা টেনে নিয়ে চেয়ার পেতে বসতে বসতে শামস কবির বললো, হ্যাঁ। কণ্ঠস্বর চিনতে পারছি। আপনার নাম তো আর জানি না।

নাম দিয়ে কী হবে। বলেইছি না, আমি আপনার পাঠিকা।

তা বলেছেন। কিন্তু আপনি আমার নাম জানেন। ফোন নম্বর জানেন। আর আমি আপনার কিছুই জানি না। এ ভারি মুশকিল না ?

কথা বলতে বলতেই জানবেন।

তা হয়তো জানবো। কিন্তু আপনি যদি আর ফোন না করেন।

না না। করবো। আমার প্রিয় কবির সাথে কথা বলার এই সুযোগটা আমি হারাবো না।

আমাকে কবি কবি বলে আপনি কেন লজ্জা দেন ?

ছি ছি! আপনি কেন এমন ভাবেন। আপনি কম লেখেন। কিন্তু খুব ভালো লেখেন।

সত্যি বলছেন ?

বারে, অকারণে কেন আপনাকে তোয়াজ করবো।

তাও তো কথা বটে। শোনেন। এ তিন দিন ধরে আমি আপনার ফোনের জন্য অপেক্ষা করেছি। আপনি ফোন করেন নি কেন ?

অপেক্ষা করেছেন নাকি প্রতীক্ষা করেছেন ?

বাহবা। আপনি বুঝি রফিক আজাদের ভক্ত।

ভক্ত না। আমি ভক্ত আপনার। কিন্তু রফিক আজাদের ওই কবিতাটা আমার মুখস্থ আছে।

ও। আপনি বুঝি সবার কবিতা মুখস্থ করে রাখেন।

এই। ঈর্ষা করছেন কেন ? আমি তো বলেইছি আমি আপনার ভক্ত।

না না। জেলাস হবো কেন ?

আরে শোনেন। টিএসসিতে কিছুদিন একটা আবৃত্তির গ্রুপ করেছি। তাদের জন্যই আসলে প্রচুর কবিতা আমাকে মুখস্থ করতে হয়েছে। রফিক আজাদের কবিতাটাও।

কবিতাটা একটু শোনাবেন ?

শুনবেন ?

প্লিজ...।

এমন অনেক দিন গেছে
আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থেকেছি,
হেমন্তে পাতা-ঝরার শব্দ শুনবো বলে
নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছি বনভূমিতে—
কোনো বন্ধুর জন্যে
কিংবা অন্য অনেকের জন্যে হয়তো বা ভবিষ্যতেও
অপেক্ষা করবো...

আমি বন্ধু, পরিচিতজন, এমনকি— শত্রুর জন্যও
অপেক্ষায় থেকেছি,
বন্ধুর মধুর হাসি আর শত্রুর ছুরির জন্যে
অপেক্ষায় থেকেছি—
কিন্তু তোমার জন্যে আমি অপেক্ষায় থাকবো না,

প্রতীক্ষা করবো;
'প্রতীক্ষা' শব্দটি আমি শুধু তোমারই জন্য খুব যত্নে বুকের তোরঙ্গে তুলে রাখলাম।

আপনি তো খুব ভালো আবৃত্তি করেন... খুব ভালো।

কেন অযথা বাড়িয়ে বলছেন?

সত্যি। আমার খুব ভালো লেগেছে।

অন্যের কবিতা। তবুও।

আপনি আমাকে খোঁটা দিচ্ছেন কেন?

না সত্যি। আমি আপনাকে অন্যের কবিতা শোনাতে চাই না। আপনার কাছ থেকে অন্যের কবিতা শুনতেও চাই না। নতুন কী লিখেছেন।

লিখি নি।

বাহ। তিনটা দিন গেলো। আপনি একটা লাইনও লিখলেন না।

না। লিখেছিলাম। ভালো হয়নি বলে ছিঁড়ে ফেলেছি।

এ আল্লা। কী করেছেন? শোনেন, ভালো হয়েছি কি হয় নি তা বিচার করার আপনি কে! আপনি লিখবেন। আমরা বিচার করবো। রায় দেবো। বুঝেছেন।

হুম।

এখন থেকে নতুন কবিতা লেখা হলে আমার জন্য তুলে রাখবেন। আমি ফোন করলে আমাকে শোনাবেন।

আর ফোন না করলে?

ফোন না করা নিয়েই কবিতা লিখবেন। ঠিক আছে।

হুঁ।

হুঁ কী। ভালো করে বলেন, বলেন হ্যাঁ।

ঠিক আছে।

গুড। এই শোনেন। আপনার অফিসের কাজে ডিস্টার্ব হচ্ছে না তো?

নাহ। চারদিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলো শামস কবির। পরিস্থিতি শান্ত। রসিক সরকার আর কায়সার দুজনেই নিজ নিজ টেবিলে বসে আছে।

অফিসে আজ বস নেই তো। স্বাধীনতা চলছে।

ইস, চলে আসবো নাকি।

আসবেন।

না থাক। আসবো না।

নামই বললেন না।

এই আজ রাখি। কাল আবার কথা হবে কেমন?

সে টেলিফোন রেখে দিলো হঠাৎই। ঝিম মেরে বসে রিসিভারটি খানিকক্ষণ হাতে ধরে রইলো শামস কবির। যে একটি কণ্ঠস্বর শোনার জন্য তিন তিনটি দিন সে কাটিয়েছে

অস্থিরতায়— যেন বিছানায় বিছানো ছিল কাঁটা, যেন গরম ভাতে ঢালা ছিল ঠাণ্ডা পানি, যেন কম্পিউটারের পর্দা জোড়া হরতাল— কোনো কিছুতেই মন বসছিল না, হাত সরছিল না, সেই ফোনটা শেষতক এলো। আর সেই মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর, তার অপার্থিব সুর, সে এমনভাবে কথা বলে যেন সেতারের তারে মৃদু টঙ্কার— শামস কবিরের সমস্ত অস্তিত্ব আবার ভরে উঠলো মহাজাগতিক আলোয়। এ অফিসকক্ষটায় যেন ভরে গেলো জ্যোৎস্নার সৌরভে।

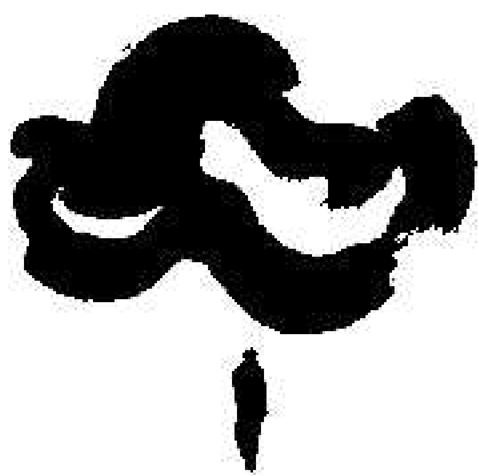
সে তাকালো রসিক সরকারের টেবিলে। আরে এ কী, কায়সার তার টেবিলের সামনে বসা, রসিক সরকার আরো একটা কাপে ব্রান্ডি ঢাললো, কায়সার কাপটা তুলে নিয়ে রসিক সরকারের হাতের দিকে বাড়িয়ে বললো, চিয়ার্স। এরই মধ্যে মিলমিশ হয়ে গেলো।

হবেই না বা কেন ? অলৌকিক বার্তা বয়ে নিয়ে টেলিফোনটা কি একটু আগে বেজে ওঠে নি ? দেবদূতীর কণ্ঠের ইন্দ্রজালে কি এ অফিসের প্রতিটি প্রাণে রচিত হয়নি শান্তির সরোবর ?

কায়সার যে নয়ন চৌধুরীর আত্মীয়, রসিক সরকার তার তাৎপর্য বোঝেন। অফিসকক্ষে বসে মদ্যপান যতো স্বাস্থ্যসম্মতই হোক না কেন, আচারসম্মত নয়— এটা না বোঝার মতো মাতাল সরকার হননি। কাজেই তিনি অচিরেই চলে গেছেন কায়সারের কাছে। সন্ধি স্থাপন করেছেন। ধূর্ত লোক, এখন খোদ কায়সারকেই পেয়ালা পিয়েছেন। অপরাধটায় এখন উভয়েই সমান অপরাধী হয়ে পড়েছে।

রসিক বললেন, শামস কবির, খাবে নাকি একটু ? চা বইতো নয়।

শামস কবির না বলতে পারলো না। আজ তার জিভ দিয়ে 'না' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। আরো একটা কাপে ব্রান্ডি ঢাললেন রসিক সরকার। গরম পানি মেশালেন। চুমুক দিলো শামস কবির। আজ তার সবকিছু মনে হচ্ছে অমৃত। এই অফিসের লোকজন অমৃতের পুত্রসব। এই জীবনটাই তার কাছে মনে হচ্ছে অমৃতময়।



দরজা খুলে বেরলোই খোলা ছাদ। চিলেকোঠার পাশে থাকার এই হলো সুবিধা। ঘুম আসছে না বলে শামস কবির এসে দাঁড়ালো ছাদে, রেলিঙের ধারে। চারদিকে কংক্রিটের জঙ্গল। কিন্তু মাথার ওপর নিঃসীম আকাশ। আজকের আকাশটা মেঘমুক্ত, আকাশ জোড়া কতো তারা, যেন গুঁড়োগুঁড়ো আলো ছড়িয়ে রেখেছে কেউ!

একটা টুল নিয়ে এসে চুপচাপ বসে থাকবে নাকি। কতো কিছু ভাবতে তার ভালো লাগছে আজ। এই যে একটা প্রশান্ত হাওয়া এসে শরীরটাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে, তেমনি একটা ভালো লাগার অনুভূতিতে শামস কবিরের হৃদয়-মন ভরে আছে।

তাহলে তারও একজন নারী আছে।

তাহলে তারও একজন আছে পাঠিকা।

এই ২৮ বছরের জীবনটায় এই একটুখানি সার্থকতার বাতাস এসে লাগলো।

আজ রাতে সে তবে আর ঘুমুচ্ছে না। ঘুম এলে আসুক। না এলে ঘুমুবে না। যতোক্ষণ সাধ যায় বসে থাকবে। তাকিয়ে দেখবে ঢাকার রাত্রি, নিস্তব্ধতার ভেতরে এখানে-ওখানে রাত্রিজাগা আলোর সাড়া।

নাহ্। কবিতা লিখলে কেমন হয়। ঘরে যেতে হলো ফের। বাতি জ্বালাতে হলো। কাগজকলম নিয়ে উপুর হতে হলো বিছানায়।

আজ তার নাম বলেছে সে। বলেছে, শুনুন, আমাকে নীলিমা বলে ডাকবেন।

নীলিমা। আপনার নাম?

ডাকবেন। নীলিমা বলেই ডাকবেন।

নীলিমা বলে ডাকবো, নাকি নীল বলে!

আচ্ছা, আপনার যেমন খুশি।

আর আমাকে কী বলে ডাকবেন?

আপনার নামতো আমি জানি।

এই নামে। এই শামস কবির নামে?

কেন! অসুবিধা কী! খুব ভালো নাম। বাংলাদেশের দুই বড় কবির নামই তো শামস দিয়ে। শামসুর রাহমান আর সৈয়দ শামসুল হক।

ওভাবে ভাবিনি তো।

আপনাকে আমি ডাকতে পারি শাম বলে। নাকি শ্যাম বলবো। শ্যাম ঠাকুর। ওরে আমার কৃষ্ণরে।

তাহলে তো আপনাকে ডাকতে হয় গৌরী বলে। নীল বলে নয়।

আচ্ছা, তাই না হয় ডাকুন।

কী, গৌরী?

হুঁ।

তাহলে আর রাধা নয় কেন?

ও বাবা। শখ কতো। নিজে হতে চায় কৃষ্ণ, আর আমাকে বানাতে চায় রাধা।

টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল শামস কবির টেলিফোনের এপারে। আচ্ছা, অফিসের ওরা সবাই কি বুঝছে না ব্যাপারটা!

আপনার আপত্তি আছে— বলেছিল শামস কবির।

নিশ্চয়। কৃষ্ণের ছিল ১৬০০ গোপিনী। আপনারও বুঝি অজস্র ভক্ত চাই! আমার মতো পাগলি পাঠিকা! অনেক!

না। একজন মাত্র চাই, একজনকেই চাই।

অ্যাই শ্যাম। এতো চাই চাই কেন বাবা।

চাইবো না ? আচ্ছা চাইবো না। চাইতে গেলে যদি হারিয়ে যান।

অ্যাই। শুনুন। শামস থেকে শ্যাম বানানোর চেয়ে কবির থেকে কবি বানানোই তো ভালো। ঠিক না ?

কী জানি। নিজ থেকে নিজেকে কবি দাবি করাটা লজ্জার ব্যাপার না।

আপনি তো বাবা দাবি করছেন না। আমি আপনাকে ডাকছি। কবি। ঠিক আছে।

আপনার যেমন মর্জি।

কবি, একটা কবিতা শোনান না।

আচ্ছা। শোনেন। আমার লেখা না। পূর্ণেন্দুপত্রীর লেখা—

> যে টেলিফোন আসার কথা সে টেলিফোন আসে নি।
> প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে
> সূর্য ডোবে রক্তপাতে
> সব নিভিয়ে একলা আকাশ নিজের শূন্য বিছানাতে।
> একান্তে যার হাসির কথা হাসে নি।
> যে টেলিফোন আসার কথা আসে নি।

হুম। কাকে বলা হচ্ছে ?

আর কাকে ?

আমাকে নিশ্চয় নয়। আমি তো বাবা রোজই ফোন করছি।

গতকাল করেছেন ?

গতকালও অনেকবার করেছি। আপনাদের দুটো ফোনই এনগেজড ছিল সারাক্ষণ।

হ্যাঁ। থাকতে পারে। নয়ন ভাই দেশের বাইরে। কায়সার আর রসিক সরকার মিলে যা শুরু করেছেন— গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বললো শামস।

তাহলে আমাকে দোষ দেওয়া কেন ?

বাহ্। আপনি তো আপনার নম্বর দিচ্ছেন না। আপনার নম্বর পেলে তো আমিই ফোন করতে পারতাম।

দেবো দেবো বাবা। এতো অস্থির কেন ? কাল যদি একটা নতুন কবিতা লিখে এনে শোনাতে পারেন, তাহলে দেবো।

এরপরও কি একটা নতুন কবিতা লিখে ফেলতে পারা তার উচিত নয়।

কাগজ-কলম নিয়ে বিছানায় একবার উপুড় হচ্ছে, একবার কাত হচ্ছে, একবার উঠে বসছে শামস— কিন্তু একটা পঙক্তিও তার মনে আসছে না। কিছুতেই না। আশ্চর্য তো!

বানিয়ে বানিয়ে লিখবে নাকি। পঙক্তির পর পঙক্তি সাজিয়ে। মিলের পর মিল দিয়ে। না, সে কবিতাটা বানিয়ে লেখায় বিশ্বাস করে না। কবিতাটা আসে। যেন কোনো দেবদূত দিয়ে যায় কোনো এক পঙক্তি। অকস্মাৎই। বানিয়ে বানিয়ে সে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি লিখতে পারে কিন্তু কবিতা নিয়ে কোনো চালাকি নয়, কোনো মেকি ব্যাপার নয়, কবিতায়

সে দিতে চায় শতকরা একশত ভাগ।

একটা রাত নির্ঘুম পার হলো। একটা পঙক্তিও সে রচনা করতে পারলো না।

ভয়ে ভয়ে সে ফোন ধরলো পরের দিন।

হ্যালো। নীল। আমি পারলাম না।

কী ?

ওই যে, তোমাকে একটা কবিতা লিখে দেবার কথা ছিল না। নতুন কবিতা। লিখতে পারি নি।

তাতে কী হয়েছে। একরাতে বুঝি কবিতা হয় ? এটা কি কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। বোতামে টিপ দিলেই বেরিয়ে গেলো অটোমেটিক মেশিনে।

জানো নীল। আমি সারারাত চেষ্টা করেছি। পারি নি।

ঠিক আছে। অমন পণ করে বসে কবিতা লিখতে হবে না। যখন হবে, তখন এমনিই হবে। কবি শুনছো।

আমাকে কবি বলো না। শুনছেন। আমাকে কবি বলবেন না। আমি তো সারা রাত আঁকিবুকি আঁকলাম কাগজে। পারলাম না।

শুনছোই তো ভালো শোনাচ্ছে। আর আমারও অভ্যাস। বন্ধুজনকে আপনি বলতে পারি না। শোনো, কবি, এই ব্যাপারটা নিয়ে মন খারাপ করো না।

কবি বলো না। শোনো কবি মিরোস্লাভ হোলুবের একটা কবিতা আছে। কবিতার নাম— 'কবির সঙ্গে মুখোমুখি'। কবিতাটা এরকম

> আপনি একজন কবি ?
> হ্যাঁ। আমি কবি।
> কী করে জানেন ?
> আমি একটা কবিতা লিখেছি।
> যখন কবিতা লেখেন, তখন আপনি কবি। কিন্তু এখন ?

বুঝলে নীল, যখন আমি কবিতা লিখছি তখন না হয় আমিই কবি। কিন্তু এখন আমি কী। আমি একজন ব্যর্থ মানুষ। একটা ক্লীব।

ছি! অমন করে বলে না। সারারাত জেগে ছিলে নাকি তুমি ?

হ্যাঁ।

যাও। ছুটি নিয়ে বাসায় যাও। গোসল করে একটা ঘুম দাও।

ঘুম আসবে না।

আমি কি তোমার ক্ষতি করছি কবি ? তা কিন্তু আমি করতে চাই নি।

না না। তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

নীল ফোন রেখে দেবার পরও শামস কবিরের ভেতরের অস্বস্তি গেলো না। রসিক

সরকার গলা আবৃত্তিকারদের মতো করে বললেন, ও শামসু, ইদানীং টেলিফোনে খালি কথা হচ্ছে, ব্যাপার কী! প্রেমট্রেম হয়ে গেলো নাকি ?

কায়সার বললো, রসিক ভাই। আজকালকার ছেলেমেয়েরা টেলিফোনে তো প্রেম করে না।

রসিক সরকার বললেন, প্রেম করে না, কী করে ?

কায়সার বললো, সেক্স করে।

কও কী তুমি ?

যা কই, হাঁচা কই।

তাইলে দেখাসাক্ষাৎ হইলে কী করে ?

তখন গল্পগুজব করে।

ক্যান। উল্টাপাল্টা ক্যান।

এইডসের ভয় আছে না। হ্যাভ সেফ সেক্স, হ্যাভ সেক্স থ্রু টেলিফোন।

যাও। চাপা মাইরো না। রসিক সরকারের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

কায়সারের কোলে যথারীতি একটা টেলিফোন সেট। সে সেটার প্রেরকযন্ত্রে হাত দিয়ে চেপে ধরে রসিক সরকারকে ডাকলো, বিশ্বাস করলেন না তো, প্রমাণ হাতেনাতে। আসেন, আসেন। ক্রস হয়ে গেছে। কী কয়, চুপচাপ শোনেন।

রসিক সরকার এগিয়ে গেলেন। চুপটি করে রিসিভার কানে ধরলেন। তার মতো বেহায়া টাইপ লোকেরও চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার নিশ্চয়ই সাংঘাতিক।

শামস কবিরের কিছু ভাল্লাগছে না। দুই চোখ লাল টকটকে। মাথার চুল উস্কোখুশকো। কায়সার বললো, শাম ভাই, কোনো সমস্যা ?

নাহ। কিছু ভাল্লাগে না কায়সার।

বলেন কী ? আপনার তো এ রোগ ছিল না। বিষণ্ণতা একটা রোগ।

আমার সমস্যাটা ঠিক ফাজলামো করার মতো কিছু না।

আরে না। আমিও সিরিয়াস। সিলেট মেডিক্যাল কলেজে দু'বছর পড়েছিলাম না। শাম ভাই, আপনি লুডিওমিল ট্যাবলেট খান। প্রতিদিন ঘুমুতে যাবার আগে।

নাহ। কায়সার ছেলেটাই আছে ভালো। সবকিছুর মূলে সে অসুখ খুঁজে পায়। সবকিছুর ওষুধও তার কাছে রেডি। কিন্তু এর ব্যত্যয়ও তো ঘটতে পারে। ওই যে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন অকারণ বিষাদের কথা।

আমার মন ভালো নেই। —কেন ? —সেকি আমি জানি ?

আমি একজনকে ভালোবাসি। —কাকে ? —কী করে বলবো, আমি কি তাকে দেখেছি। এই যে মনের অবস্থাটা, তা অকারণেই। রবীন্দ্রনাথ তার গানে-কবিতায় বার বার তাই বলেছেন— 'কী জানি', 'কে জানে', 'কেন জানি'।

এসব কথা কায়সারের সঙ্গে আলাপ করাও যায় না। কার সঙ্গেই বা যায়। (কেবল নীলের সঙ্গে ছাড়া)

অফিসের কিছু লেখালেখি আছে বরং সেদিকে মন দেওয়া যায়। হাইজিন ইসবগুলের বিজ্ঞাপনী শ্লোগানটি লেখা দরকার।

হাইজিন ইসবগুল
পেট পরিষ্কার মন পরিষ্কার

হাইজিন ইসবগুল
দূর হবে অম্লশূল

দূর হবে পিত্তশূল
হাইজিন ইসবগুল

আমি আর লেট লতিফ নই

বিকল্প শ্লোগান কতোগুলো টাইপ করলো শামস কবির। কিন্তু একটাও মনঃপূত হলো না। না হলেও এগুলো রেখে দিতে হবে। ক্লায়েন্টকে দেখাতে হবে। ভালো কিছু একটা লেখা দরকার। দুরো ছাই, আমি এসব কী লিখছি। আমার না মন ভালো নেই!

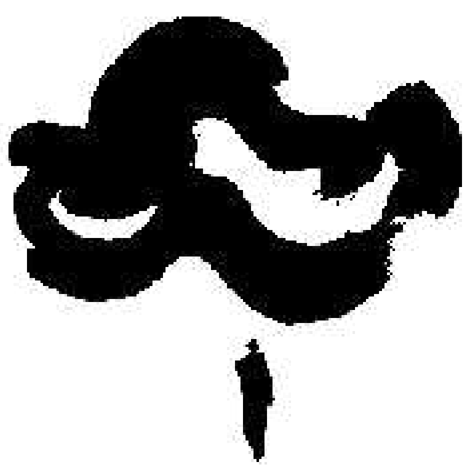
সে উঠে পড়লো কম্পিউটার থেকে। বললো, রসিদ ভাই, শরীরটা ভালো না। আজ আর অফিস করবো না।

আচ্ছা যাও। ছেলেপুলে মানুষ— মাঝেমধ্যে ফাঁকি দেওয়া ভালো। রসিক সরকারের অনুমতি পাওয়া গেলো। আর শোনো, ওই দিনের ঘটনাটা আবার বসের কানে তুলে দিও না।

না না। কী যে বলেন না রসিদ ভাই— শামস কবির অফিস ছাড়লো।

আর অফিস ছেড়েই সে বুঝলো ভুল হয়ে গেছে। এখন সে যাবে কোথায়? সারাটা বিকেল এখন সে করবে কী? শায়লাকে খুঁজে বেরোবে। তানিয়ার খোঁজে।

সে শাহবাগের দিকে হাঁটতে লাগলো। হেঁটেই সে শাহবাগ পৌছবে আজ।



হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি। ঠিক হাজার বছর হয়তো নয়। একটু কম। কয়েক মিনিট। মতিঝিল থেকে ধীরে ধীরে প্রেসক্লাব হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আর রমনা পার্কের মধ্যদিয়ে হাঁটছে শামস কবির। মাথার ওপরে সূর্য। নীল আকাশ। শাদা শাদা মেঘ। দুপুরবেলা। তাই হয়তো রাস্তাঘাট একেবারে জনভারে, যানভারে উপচে পড়ছে না। হাঁটতে ভালোই লাগছে।

কবিত্ব করবে নাকি খানিক! রমনা লেকের পাড়ে গিয়ে বসে পড়বে বেঞ্চিতে? দিবানিদ্রারত ভবঘুরেদের পাশে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়বে কুণ্ডুলি পাকিয়ে? রমনা পার্কে ঢুকে লেকের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে পৌঁছলো শাহবাগে। পিজি হাসপাতালের

নিচে। পত্রিকার দোকানে দাঁড়ালো। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কতোগুলো পত্রিকা ওল্টালো। দূর থেকে লক্ষ্য করলো কতোগুলো বাংলাদেশী আধাপর্ণো পত্রিকার মলাট। একটা পত্রিকার মলাট বলছে— এবার জানা যাবে টিভি-অভিনেত্রী মাধুর উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবনের কথা। টিভি অভিনেত্রী মাধুটা কে ? বহুদিন অবশ্য টিভি দেখে না শামস কবির। অফিসের ছোট রঙিন টিভিটি রসিক সরকারের থাবার নিচে— তাতে সারাক্ষণ চলছে ফ্যাশন চ্যানেল। অবশ্য কিছু বলারও নেই। একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থার অফিসে তো ফ্যাশন চ্যানেলই চলা উচিত সারাক্ষণ।

হঠাৎ তার মনে হলো, মাধু মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছে। আরে, এ তানিয়া না ? সেই যে তার কাছে এসেছিল— একবার। কী জানি। ঠিক ধরতে পারছে না। সে হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটি তুললো। পিনআপ করা। ওপরে মাধুর আবক্ষ শাদা-কালো ছবি। বুকের কাছে দুটো কালো পট্টি মারা। পত্রিকাটি কেনার সাহস শামস কবিরের নেই। কিন্তু মাধু মেয়েটাই তানিয়া কি না এটা জানতেও তার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।

হ্যালো ফ্রেন্ড, কী খবর তোমার। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত্রি হয়। এ অসময়ে আবার ফ্রেন্ড উদিত হলো কোত্থেকে। চটচলদি পিনআপ পত্রিকাটা রেখে দিলো শামস। ঘুরে তাকালো পেছনে। তার দিকে তাকিয়ে একটা লোক অনেকগুলো দাঁত বের করে হাসছে। কিন্তু লোকটা মোটেই তার পরিচিত নয়। সে বলতে যাচ্ছিল— আপনাকে তো ঠিক...— তখনই তার ঘাড়ের কাছ দিয়ে অন্য একটি লোক চলে গেলো বিকশিত দন্তের কাছে!

যাই। আজিজ সুপার মার্কেটে যাই। সে আজিজ সুপার মার্কেটে গেলো। পাঠক সমাবেশ আর সন্দেশে ঢুঁ মারলো। একটা 'দেশ' ঝুলছে ক্লিপে। হাতে তুলে নিয়ে উল্টাতে লাগলো— ভালো কোনো কবিতা যদি চোখে পড়ে— শক্তির, জয়ের। নাহ্, তেমন কিছু নেই।

সে মার্কেটের বারান্দার সিঁড়িতে বসলো। দুপুরবেলা— মার্কেট ফাঁকা ফাঁকা। হঠাৎই তার সামনে এসে একটা রিকশা থামলো। আরোহীকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো শামস কবির।

কবি সিরাজ সরদার। লোকটা একবার এক সাক্ষাৎকারে প্রিয় তরুণ কবির নামের তালিকায় শামস কবির নামটাও বলেছিল। এজন্য সিরাজ ভাইকে মান্যই করে শামস কবির। সিরাজ সরদার বললেন, যুবক, এই মধ্যাহ্নে তুমি একা কেন ? ওঠো আমার পাশে।

শামস কবির গিয়ে বসলো রিকশায়, সিরাজ সরদারের পাশে। রিকশা গিয়ে দাঁড়ালো সাকুরার সামনে। এসো, দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিই।

প্রবীণ কবির পেছনে পেছনে গেলো নতুন কবি। বসে পড়লো একটা প্রায়ান্ধকার কোণে। পরাটা, মাংস আর হান্ড্রেড পাইপার্সের অর্ডার দিলেন সিরাজ।

বললেন, তুমি বসো। আমার একটু বাথরুম পেয়েছে।

এই দুপুর বেলা মদ্যশালায়! কলেজ শিক্ষক বাবার ছেলে তুমি, এখানে কী করছো। কবিত্ব। শামস কবির, এটা তো ষাটের দশক নয়। সত্তরও নয় যে মদ্যপান না করলে কবি হওয়া যাবে না। এখন কবি হওয়ার জন্য মাদকাসক্ত অপরিহার্য নয়। আমি

মাদকাসক্তির চর্চা করছি না, আমি সামান্য মদ্যপান করবো। ভালো জিনিস। হান্ড্রেড পাইপার্স বিদেশী সুস্বাদু হুইস্কি। তাতে কি তোমার বদ্ধ মাথাটা খুলবে। যে পঙক্তিটা তুমি খুঁজে পাচ্ছো না ? জানি না। জানি না।

সিরাজ ভাই পান করছেন অত্যধিক। শামস কবির মাত্র দু'পেগ খেয়েই বিরতি দিতে চায়। সিরাজ ভাই রেগে যাচ্ছেন। খাও না কেন ? বলো, খাচ্ছো না কেন ? আমি তোমার আব্বার মতো। তোমার মতো যদি একটা ছেলে আমার থাকতো। লক্ষ্মী ধরনের ছেলে। নাও, খাও আব্বু।

শামস কবির খাবে। তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন তৃষ্ণা। আচ্ছা, তানিয়া কি মাধু হয়েছে! তার বক্ষসম্পদ কি এমনি ঐশ্বর্যময়। মেয়েটা যেদিন তার কাছে এসেছিল, তার বাসায় যেতে চেয়েছিল— শামস কবির রাজি হয়নি কেন ? কেন তার শারীরিক সৌন্দর্য আর জ্যামিতিক অনুপাতের দিকে সে চোখ তুলে তাকায় নি। আহা, তাকে তো নিজের ঘরটায় সে নিতে পারতো। তার বিছানায়। একটা প্রগাঢ় চুম্বন তো অন্তত করতে পারতো। হয়তো আরো নানা কিছুই সম্ভবপর ছিল। ইস সেদিন কেন মনে হয় নি।

শামস কবিরের শরীরের মধ্যে এই সব কল্পকামনার প্রতিক্রিয়া। সে বললো, সিরাজ ভাই, আমি একটু বাথরুমে যাবো। ওটা যেন কোনদিকে। নাহ্। ওই পিনআপ পত্রিকাটা কিনতে হতো। শালা, সে এতো ভিতু কেন ?

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলো সিরাজ ভাই মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একজন ওয়েটার তাকে ধরে তোলার চেষ্টা করছে। স্যার আর খাবেন না স্যার— ওয়েটারের কথা তিনি শুনতে চাইছেন না। তার আরো চাই।

সিরাজ ভাই, চলেন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

না শামস। বাসায় যেতে চাই না। তোমার ভাবি রাগ করবেন।

করবে না। চলেন।

না শামস। মেয়ে দুটো বড় হয়েছে। ওরা ওদের বাবাকে এ অবস্থায় দেখলে খুব মনখারাপ করে।

আপনার মেয়েরা কি এখন বাসায় ? স্কুলে নিশ্চয়। চলেন।

আচ্ছা চলো।

সিরাজ ভাইকে ধরে ওয়েটারের সহযোগিতায় রিকশায় তোলা হলো। সিরাজ ভাই মাথা এলিয়ে দিলেন শামসের কাঁধে। বললেন, শামস, তুমি বড়ো ভালো লেখো। এতো মিষ্টি তোমার হাত। তুমি কিন্তু থামবে না। লিখে যাবে। তোমার মতো যদি আমার একটা ছেলে থাকতো। তোমার মতো...

রিকশা গিয়ে ঢুকলো ভূতের গলিতে। একটা পাঁচতলা ফ্লাট বাড়ির চারতলায় সিরাজ ভাইয়ের বাসা। শামস কবির নিচে থেকে কলিং বেল টিপলো।

রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে রিকশাওয়ালারই সাহায্য নিয়ে সিরাজ ভাইকে নিয়ে এলো ভবনটার সিঁড়ির মুখে।

চারতলা থেকে নেমে এলো এক অপূর্ব সুন্দর কিশোরী। সিঁড়ির মুখে আলো-অন্ধকারে মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে অপ্সরীর মতো। শামস কবির পূর্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে

রইলো। মেয়েটির চোখে-মুখে একরাশ বিষণ্ণতা। (রূপসী ও বিষাদময়ী সমার্থক ও যে নারী চুম্বনযোগ্য তার চোখ অশ্রুতে মলিন!)

রিকশাওয়ালা বিদায় নিলে মেয়েটি এসে তার বাবার বাঁ হাত ধরলো। ডান হাত ধরে আছে শামস কবির। সিরাজ সরদার বললেন, মা জুঁই, মা জুঁই, ধরতে হবে না... আজ আমি মোটেও পান করি নি...। তার গলা জড়িয়ে আসছে, পা এলোমেলো।

জুঁই বললো, আব্বু, তুমি চুপ করে থাকো। কথা বলো না তো।

সরু সিঁড়ি। তিনজন পাশাপাশি উঠতে অসুবিধা হচ্ছে। তার ওপর শামস কবির নিজেই টালমাটাল। চার তলা পর্যন্ত উঠতে গিয়ে মনে হচ্ছে এই সিঁড়ি শেষ হবে না।

শামস কবির, বোধকরি দ্রব্যগুণে, বললো, জুঁই, আমার নাম শামস কবির। আমি কবিতা লিখি।

সিরাজ সরদার বললেন, ঠিক, ও আমার চেয়ে অনেক ভালো লেখে... ও ছেলে বললো, মদ খাবো, পয়সা নেই, তাই খাওয়ালাম। আমি খাই নি। ও খেয়েছে!

শামস কবির বললো, হ্যাঁ। সিরাজ ভাইয়ের তো দুপুরবেলা খেতে যাওয়ার কথাই নয়। আমার চাপে পরে গেলো আর কি!

চারতলা এসে গেছে। সামনেই দরজা। সেই স্পেসে দাঁড়িয়ে জুঁই বললো, আমাকে বানিয়ে কথা বলতে হবে না। আমি জানি, আব্বু রোজ এই কাণ্ড করেন। আমি এতো মানা করি, তবু করেন। আমার বন্ধুরা কী সব বলে...। মেয়েটি কাঁদকাঁদ।

দরজা খুলতে দেখা পাওয়া গেলো ভাবির। ভালো একটা মহিলা। ড্রেস করে শাড়ি পরেছেন। চোখে চশমা। মুখ গম্ভীর। কোনো কথাও বললেন না তিনি, স্বামীকে ধরে একটা বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

আমি আসি— শামস কবির বললো। কেউ আপত্তি করলো না। শামস কবির বেরিয়ে এলো। আস্তে আস্তে রেলিং ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো। খানিকক্ষণ নামার পর তার মনে হলো, জুঁই নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সে পেছনে তাকালো। সত্যি, মেয়েটি দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের চোখাচোখি হলে শামস কবির চোখ নামিয়ে নিলো। জুঁইয়ের চোখে জল টলমল করছে।

শামস কবিরের মনটা উঠলো হু হু করে।

ভূতের গলিতে দাঁড়িয়ে রিকশা খুঁজছে সে। তার মন কেমন যেন করছে। আমার মন ভালো নেই। কেন, আমি জানি না। বাবার কণ্ঠে শোনা শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর কথা মনে পড়ছে। অ্যান্টনিও বলছে, নাটকের শুরুতেই নাকি, 'ইন সুথ আই নো নট হোয়াই আই এম সো স্যাড।' —আমার মন ভালো নেই। —কেন? জানি না। —আমি একজনকে ভালোবাসি। —সে কে? কী করে বলি। আমি কি তাকে দেখেছি? বুদ্ধদেব বসুর শেখানো পঙক্তিগুলো ভেতরে বুদ্‌বুদ তুলছে। এই রিকশা, চলো মগবাজার। শামস কবির তার ঘরটিতে ফিরে যেতে চায়। খাতা-কলম তাকে ডাকছে। প্রজাপতির মতো উড়ে এসে তার মাথায় জমছে কবিতার পঙক্তিমালা। সেসব পুনরায় উড়ে দূরে সরে যাবার আগেই ধরে ফেলতে হবে। লিখে ফেলতে হবে কাগজে-কলমে।

এক বৈঠকে দুদুটো কবিতা লিখে ফেললো শামস কবির। লেখা শেষ হয়ে গেলে কবিতা দুটো ফের পড়লো। ভালোই হয়েছে মনে হচ্ছে।

শরীর শিথিল হয়ে আসছে। ঘুম পাচ্ছে। জিন্সের শার্ট, গাঢ় নীল জিন্সের প্যান্ট, রঙ ওঠা, হাল্কা, পায়ে জুতামোজা— শামস কবির ঘুমিয়ে পড়লো। দরজাটা খোলাই রইলো— সারা রাত।



শামস কবির দুটো কবিতা লিখে ফেলেছে। এ দুটো কবিতা পড়ে শোনানো দরকার নীলকে। তাহলে, নীল বলেছে, তার বাসার ফোন নাম্বার জানাবে শামস কবিরকে। ৬ ডিজিটের একটা ফোন নম্বর— যেন স্বপ্নলোকের চাবি। যেন সব পেয়েছির দেশে প্রবেশের ছাড়পত্র।

সকাল সকাল অফিসে গেলো শামস। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ভোরে। খোলা দরজা-জানালা দিয়ে বাতাস আসছিল। তবু বিছানায় কুঁকড়ে খানিকক্ষণ পড়ে ছিল সে।

আজ তাকে দেখাচ্ছে ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। শেভ করা গাল— ভরাট, একটু ফর্সা ধাঁচেরই। ঘন দাড়ি কাটা হয়েছে বলে গাল দুটো সামান্য নীল। আজ তার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। লন্ড্রিতে দুটো কাপড় দেওয়া ছিল— আনিয়ে নিয়ে পরেছে। নিপাট ভদ্রলোক। মনটাও আজ ভালো।

রোদ ঝলমলে আকাশ দেখে সে বিড়বিড় করতে থাকলো— সকালবেলা রোদ উঠলে সবাই জেনে যায়, আজ নীরা ভালো আছে... ঠিকভাবে মনে পড়ছে না সুনীলের কবিতাটা, না পড়ুক, তবু তো রোদ উঠেছে, তবু তো আকাশ ঝকমক করছে; আজ নিশ্চয় তার নীলেরও মন ভালো, আজ নিশ্চয় সে ফোন করবে। অফিসে গিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক ঘেঁটে বের করলো আজকের রাশিচক্র। রাশি বলছে— আজ অফিসে ঝামেলা হতে পারে, উর্ধ্বতনের মনরক্ষা করে চলুন।

সর্বনাশ। তাহলে কি নীল আজ ফোন করবে না ? ইস, এ সময় যদি নীলের নম্বর তার জানা থাকতো, তাহলে সে তো এখনই ফোন করতে পারতো, শোনাতে পারতো তার কবিতা দুটো।

সকাল ন'টায় অফিস। সে পৌঁছেছে পৌনে ন'টায়। ঠিকে ঝাড়ুদারনি কেবল অফিস ঝাড়ু দিচ্ছে, বাথরুম পরিষ্কার করছে। কায়সার কিংবা রসিক সরকার আসবেন আরো পরে। দু'জন আর্টিস্টও আছেন অফিসে, তারা পার্ট টাইমার, বিকেলের শিফটে আসেন।

ফাঁকা অফিসকক্ষে বসে কী আর করা, শামস কবির কবিতা দুটো নিয়ে বসলো। একটা মোটা ডায়েরিতে সে কবিতা লেখে। কবিতা দুটো কপি করা দরকার। হয়তো একটু ঘষামাজাও।

পুনর্বার পড়তে গিয়ে শামস কবির বেশ মুগ্ধ হলো। কালকের রাতটা বেশ ঘোরের মধ্যে ছিল সে, নইলে এ কী কবিতা লিখেছে সে। কোত্থেকে পেয়েছে সে এইসব চিত্রকল্প, এই সুর, এই বাক্যাবলির স্রোত? নাহ্। একটা শব্দও সে বদলাতে চায় না এ পদ্য দুটোর।

তবে কেবল আত্মমুগ্ধ হলেই তো হবে না, দ্বিতীয় কোনো পাঠকের মন্তব্য চাই।

নীল— একটা ফোন করো তো লক্ষ্মী মেয়ে। শামস কবির টেলিপ্যাথি করার চেষ্টা করছে। এ শহরে যেখানেই নীল নামের কিংবা নীল এই সংকেত দিয়ে পরিচিত একজন নারী থাকুক না কেন, সে যেন সাড়া দেয়। নীল, সোনামাণিক, ফোন করো।

নীল, লক্ষ্মী সোনা, ফোন করো।

নীল, জাদুটোনা, ফোন করো।

রিং বেজে উঠলো— ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন। ছুটে গিয়ে ধরলো শামস কবির— যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। হ্যালো— বুকের ধুকপুকুনি থামার আগেই ক্ষীণস্বরে বললো সে।

হ্যালো, কে কবির, আমি নয়ন।

জি নয়ন ভাই, বলেন।

তুমি অফিসে আসছো ঠিক সময়ে, ভালো করছো, তোমাকেই দরকার। থাকো, সুখবর আছে, আমি আসতেছি।

নয়ন ভাই ফোন রেখে দিলেন। শামস কবির স্তম্ভিত। সে কী ফোন চেয়েছিল, আর এ কী ফোন!

ইতিমধ্যে রসিক সরকার এসে গেছেন অফিসে। কায়সারও এলো খানিক পর। রসিক সরকার বললেন, এই, চা খাওয়াবে কেউ? শামসু, খাওয়াবে নাকি?

জি। খাওয়াই, ফরিদ, এই ফরিদ, চা আনো তো তিন কাপ— শামস কবির ফরিদকে দশ টাকার নোট বুঝিয়ে দিলো।

নয়ন ভাই এলেন আরো খানিকক্ষণ পর। শামস কবিরকে ডেকে নিলেন নিজের ঘরে। বললেন, কবির, একটা কাজ পাওয়া গেছে। খুব ভালো কাজ। আমরা একটা ১২ পাতা ক্যালেন্ডার করবো। বিষয় হলো, বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। ১২ পৃষ্ঠায় ১২ ধরনের পেশার লোকের ছবি থাকবে। বিচিত্র পেশা– কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতি, চাষী— আর কী বলো তো।

রিকশাওয়ালা, নির্মাণ-শ্রমিক, গার্মেন্টিস-শ্রমিক। শামস কবির বললো।

আচ্ছা ঠিক আছে, প্রধান পেশা ১২ রকম বার করো। আর বার করো বিচিত্র অদ্ভুত পেশা। এইটা ১২ রকম। ক্লায়েন্ট যেটা খায়, নয়ন ভাই বললেন।

বিচিত্র পেশা মানে কী?

এই যেমন ধরো— কান পরিষ্কার করে, কুয়া সাফ করে, দা-বঁটি ধার দেয়।

বুঝেছি। পাখি ধরে বা বেচে, লোহার পুলে রিকশা ঠেলে, কালা সাবান বেচে— এই রকম।

গুড। গুড। এখন তুমি একটা কাজ করো— সোজা বাংলা একাডেমী যাও। দেখো, শ্রমজীবী মানুষের ওপর কোনো বইপত্র আছে কি না। তারপর শাহবাগ, নিউমার্কেট

বইয়ের দোকান। এবাদত সাহেব আসছে। টাকা নাও। ১০ হাজার টাকার শুধু বই কেনো।

শামস কবির নয়ন ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা পাতা ফটোকপি করার আগে যিনি বলেন, টাকা নষ্ট করবা, হাতে কপি করলে হয় না, তিনি ১০ হাজার টাকার শুধু বই কেনার পারমিশন দিচ্ছেন। ব্যাপার কী! কতো টাকার কাজ!

ফটোগ্রাফি নিয়া চিন্তা নাই— লোক আছে। শুধু স্ক্রিপ্টটা নিয়াই চিন্তা। স্ক্রিপ্টই ঝামেলা। আমি অবশ্য শিয়োর, আমাদের শামস কবিরের মতো ব্রিলিয়ান্ট স্ক্রিপ্ট কেউ লিখতে পারবে না। এই ভরসা। নয়ন ভাই ইন্টারকম তুললেন।

হ্যাঁ। এবাদত আসছো। দ্যাখো তো, টাকা আছে নাকি, কবিরকে ১০ হাজার টাকা দ্যাও। আর শোনো ও কতো টাকা স্যালারি পায়, হ্যাঁ কবির... আচ্ছা, সামনের মাস থেকে বাড়ায়ে দাও। দাও। দুই বাড়াও।

ইন্টারকম রেখে নয়ন ভাই বললেন, যাও, এবাদত সাহেবের কাছে থেকে টাকা নাও। নেক্সট মানথ থেকে স্যালারিও একটু বাড়বে, বুঝলে।

থ্যাংক ইউ নয়ন ভাই।

শামস কবিরকে বেরোতেই হলো, অগত্যা। তার পা সরতে চাইছে না। তবু তাকে অফিস ত্যাগ করতে হচ্ছে। যে টেলিফোন আসার কথা, [illegible] আসে না... তার মনের মধ্যে গুঞ্জন। আইসাই হালায় কী লাভ, যার ফোন ধরার কথা, এই হালায় তো ভাদাইম্যার মতো ঘুইরা বেড়ায়! নিজেকে নিজেই সে গালি দেয়।

তবুও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। নীলের ফোন পেলো শামস কবির, দুদিন পর। হ্যালো, শামস কবির আছেন— কায়সারের ফোনে বেজে উঠলো মধুস্বর। আছে ধরুন— কায়সারের জলদগম্ভীর স্বর।

শামস কবির ধরলো— হ্যালো।

উফ বাবা। কবিকে পাওয়া গেলো তাহলে।

আমি ভীষণ রাগ করেছি। কথা বলবো না।

রা-গ। কেন গো।

নীল, পুরো দু'দিন আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয় নি। অথচ এই দু'দিন আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য কী ব্যাকুল হয়ে ছিলাম!

ও মা। এখন বুঝি ব্যাকুল নও।

না মানে। এখন হঠাৎ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। একটু পরে বেরোতে হবে ক্যালেন্ডারের জন্য ফটো তুলতে।

কার ছবি তুলছো। মৌ-নোবেলের?

না।

তাহলে?

রাস্তার লোকের। বিচিত্র পেশার মানুষদের।

যেমন ?

এই ধরো সাপ খেলা দেখায়, মাথায় লাল কাপড় বেঁধে চানাচুর বিক্রি করে।

তাহলে তো আমিও মডেল হতে পারি, না!

পারো। বেদেনীর দলে ভিড়িয়ে দেবো। কোমর বাঁকিয়ে হাঁটতে হবে। সাপের শরীরের মতো হিলহিলে কোমর।

ইস। আমার কি আর ওদের মতোন সুন্দর ফিগার হবে!

তোমার ফিগার নিশ্চয় খুব সুন্দর। এই, কবে তোমাকে দেখবো ?

কী দরকার দেখার। এই তো বেশ চলছে।

না, চলছে না। থেমে আছে। গত দু'দিন ৪৮ ঘণ্টা আমি তোমার ফোন না পেয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম।

মোটেই না। মিথ্যে বলো না। আমি ফোন করেছিলাম, তুমি অফিসে ছিলে না।

সত্যি। আমার এমনি কপাল। লক্ষ্মী এলেন ঘরে, টেলিফোনের তার বেয়ে, আর আমি তার চরণ ছুঁতে পারলাম না। শোনো, আগে তোমার নম্বরটা বলো। আমি যদি তোমাকে ফোন করতে পারতাম, তাহলে এ সমস্যা হতো না। তাড়াতাড়ি বলো।

তুমি কবিতা লিখেছো ?

হ্যাঁ। দুটো।

সত্যিই।

হুম।

পড়ে শোনাবে ?

এখন। আচ্ছা। শোনো দেকি কি...

তুমি কি কেবলি যাও কখনো আসো না
আলোকবর্ষের মতো দীর্ঘতম পথ
পাড়ি দিয়ে অনন্ত প্রতীক্ষা শেষে হয়তো বা আসো
দরজায় রিকশা দেয় তাড়া
কে বাজায় অলীক ইশারা
যাই যাই বলে দোলে অমলিন সোনা
তুমি কি কেবলি যাও কখনো আসো না...

এই নয়ন ভাই ডাকছেন। ফোন ছাড়তে হবে। কেমন লাগলো ?

খুব সুন্দর! তা জনাব, মেয়েটি কে ?

তিনিই, যিনি শুধুই যান। কখনো আসেন না।

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে...।

রিকশায় চড়ে আসে...

আরে না। টেলিফোনের তার বেয়ে আসে। আসে না তো! শুধু চলে যায়। আমাকে কিলিয়ে পাকিয়ে চুরমার করে দিয়ে যায়। এখন হলো তো তোমার কবিতা। শর্ত অনুসারে এখন তোমার নাম্বারটা আমার পাওনা।

আচ্ছা লেখো।

লিখবো না। কাগজে লিখলে নম্বর, কাগজ ছিঁড়ে যাবে। পাথরে লিখলে নম্বর পাথর ক্ষয়ে যাবে। হৃদয়ে লিখলে নম্বর, সে নম্বর রয়ে যাবে... বলো।

...থ্রি এইট ফোর।

...থ্রি এইট ফোর। ঠিক আছে?

হ্যাঁ। এই শোনো। কখন ফোন করবে।

যখন ইচ্ছা তখন। পাড়ার ফোন-ফ্যাক্সের দোকানের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। রাত দুটো থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ও আমাকে দেবে স্পেশাল কনসেশন। তিন ঘণ্টা মোটে ত্রিশ টাকা।

না না। রাতে কোরো না। দিনের বেলায়। অফিস সময়ে।

কেন?

বাসায় অসুবিধা আছে। দিনের বেলায় বাসায় গার্জিয়ানরা কেউ থাকে না। আমি ফ্রি থাকি।

আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তাহলে শুনে আসি নয়ন ভাই কী বলেন?

আচ্ছা। এসো। রাখি তাহলে। ফের কথা হবে।

শামস কবির অপেক্ষায় থাকে, নীল রাখুক আগে ফোনটা। নীল কানে ধরে বসে থাকে, কবির রাখুক। কেউ রাখে না। টেলিফোন উভয়ের শ্বাস শোনা যায়।

নয়ন চৌধুরী ডাকলেন, কবির শুনে যেও একটু।

শামস কবিরকে রাখতে হয়। নয়ন ভাই বললেন, শোনো কবির, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, আজ কিন্তু তোমাদের অন্তত তিনটা ছবি তোলা চাইই।

জি আচ্ছা। শামস কবির বললো।

ফটোগ্রাফার আসে নি ক্যানো। ফোন করো। ফোন করে খোঁজ নাও।

জি আচ্ছা।

নয়ন চৌধুরী বিদায় নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ফোনের কাছে চলে গেলো শামস কবির। সদ্যপ্রাপ্ত ফোন নম্বরটায় একটু আঙুল বোলানো দরকার। সে হাতে রিসিভার তুললো, তারপর একটা একটা করে ডিজিট টিপলো। রিং হচ্ছে, রিং হচ্ছে। তার বুকের ভেতরে শব্দ হচ্ছে হাতুড়ি পেটানোর।

হ্যালো।

নীল।

কবি।

হুম।

কী। বলো।

কী বলবো। দেখলাম, নম্বরটা ফোনে আছে কি না।

অ্যাই, তোমার নয়ন ভাইয়ের সঙ্গে কথা শেষ?

হ্যাঁ। উনি বললেন ফোন করতে, তাই করলাম।

উনি আমাকে ফোন করতে বললেন!

তা না। ফটোগ্রাফারকে ফোন করতে বললেন। করতে হবে না। টিংকু ভাই নিজেই আসবেন। খুব ভালো হলো। রসিক সরকার, কায়সার— কেউ মাথা ঘামাতে পারবে না। ওরা তো আর জানে না, আমি তোমার নম্বর পেয়ে গেছি...

ইস। তরকারিটা মনে হয় লেগে গেলো। গন্ধ বেরিয়েছে। তুমি একটা সেকেন্ড ধরো। আমি নামিয়ে আসছি।

শামস কবির ধরে রইলো। তার মনে জিজ্ঞাসা দেখা দিলো, সঙ্গত কারণেই, কে এই নারী। গৃহবধূ? কোনো পক্ষাঘাতগ্রস্তা মধ্যবয়স্কা? স্বামী পরিত্যক্তা? হঠাৎই তার মনটা ভীষণ দমে গেলো। তখন নিজে নিজেকে প্রণোদনা জোগাতে লাগলো— সে যেই হোক, সে তাকে দিয়েছে কবির মর্যাদা। সেই তার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিতজন। একমাত্র এই মানব সন্তাটির জন্যই যেন শামস কবিরের জন্ম, বেড়ে ওঠা, কবি ও যুবক হয়ে ওঠা।

হ্যালো।

কী রাঁধছিলে?

এই তো। চিংড়ির দোপেঁয়াজা।

স্বামীর জন্য?

কার স্বামী।

গৃহস্বামী।

গৃহস্বামী বলতে কেউ এ গৃহে নেই।

আমি থাকি আর আমার মা থাকেন। দুজনে মিলে আমার ছোট সংসার।

একটু আগে কিন্তু অন্য কথা বলছিলে। বলছিলে, রাতে বাসায় গার্জিয়ানরা থাকে।

গার্জিয়ানরা বলেছি নাকি। আসলে মার কথাই বলছিলাম। মা ভীষণ রাগী। এমন বদরাগী মহিলা আর কেউ নেই এ দুনিয়ায়। লৌহমানবী।

মার্গারেট থ্যাচার?

তার চেয়েও বেশি।

বেগম খালেদা জিয়া?

না না। উনি তো মোমের পুতুল।

শেখ হাসিনা?

ঝগড়াটে হিসেবে অবশ্য তার সঙ্গে তুলনা চলে।

আর তোমার তুলনা কার সঙ্গে চলে ?

নাহ্। এসব কারো সঙ্গে নয়।

ফুলন দেবী ? মমতা ?

কোন মমতা। কুলকার্নি ?

না না। পশ্চিমবঙ্গের। ব্যানার্জি।

হুম। তুমি আমাকে তাই ভাবো বুঝি।

না। নীল তোমাকে আমি ভাবি রবীন্দ্রনাথের সেই নহ মাতা নহ বধূ নহ কন্যা নন্দনবাসিনী উর্বশী।

আমি মোটেও তা নই। দেখতেই পেলে এই মাত্র চিংড়ির দোপেঁয়াজা নামিয়ে এলাম। এই দুপুরে খেয়েছো ?

না।

কী খাও ?

মতিঝিলে তো আর রেস্টুরেন্টের অভাব নাই। একেক দিন একেকটা।

এসব খেয়ে পেটটাকে কী বানাচ্ছো ?

গ্যাস চেম্বার। শোনো, আমাদের নয়ন ভাই কী খান, জানো ?

কী ?

হটপটে ভাবি গরম ভাত পাঠান। প্রায়ই ওদের পিয়ন-ড্রাইভারদের দিয়ে উনি পেটিস বার্গার ফ্রায়েড চিকেন নানা কিছু খান।

যাহ্। ভাবি যদি জানতে পারেন!

দুঃখ পাবেন।

বেচারা!

আর দ্যাখো, আমার খাওয়ার জায়গা নাই, খাবার সাজিয়ে দেওয়ার লোকও নাই।

অ্যাই। তুমি বুঝি তোমার বউকে দিয়ে ভাত রাঁধা আর বেঁধে দেওয়ার কাজ করাবে।

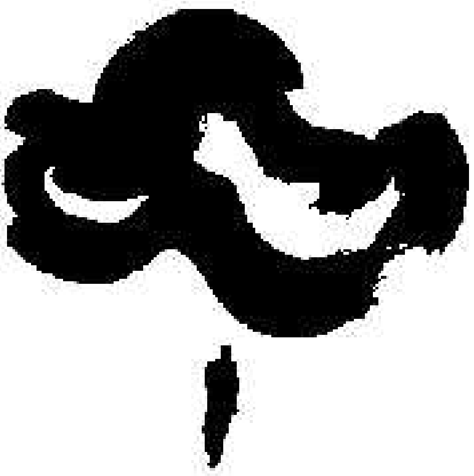
তা বোধহয় নয়। সে তার যা ভালো লাগে তাই করবে। স্বাধীন। আর তুমি কী করবে ? স্বামীর পদসেবা ?

হ্যাঁ। করবো। স্বামীর পা টিপে দেবো। তার পাকা চুল তুলে দেবো। তার জুতো এগিয়ে দেবো।

সত্যি ? সে সব যেন চোখ দিয়ে কোনোদিনও দেখতে না হয়। তুমি আমার কবিতার নারী। তুমি আমার কবিতা। তুমি কবিতার মতো সুন্দর। রহস্যময়। তুমি কাজ করো নীরবে। নিভৃতে। কাজের মানুষের কাছে তুমি অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য। তুমি কুমড়োর ফুল নও যে বড়ি বানানো যাবে। তোমার কোনো ফাংশনাল মূল্য নেই। কিন্তু তুমি অমূল্য। কেবল কবিরাই বহু ভাগ্যে তোমাকে পান। তুমি জীবনানন্দ দাশের অনামিকা স্যান্নাল। তুমি রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরণ, মৈত্রেয়ী, বিজয়া। তুমি সুনীলের নীরা। শামস কবিরের

কণ্ঠস্বর শ্বাসময় শোনালো, শোনালো— যেন অন্য কোনো গ্রহ্ থকে ভেসে আসছে এমন।

আর চড়ুই পাখির মতো ঠোঁট কাঁপিয়ে জ্যোৎস্নাঝরা কণ্ঠে নীল বললো, অমন করে বলো না... আমি খুবই সামান্য... খুব... তবু তোমার সঙ্গে আমি একটা সম্পর্ক গড়ে নিয়েছি... যেটা ঠিক কাজের সম্পর্ক নয়, চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক নয়... দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নয়, একেবারেই পৃথিবীর ধূলিকাদা থেকে দূরবর্তী একটা সম্পর্ক... হয়তো কবিতাই হতে পারে যার উদাহরণ... তুমি যদি লেখো, ভালো লেখা লেখো, চমৎকার কবিতা লেখো, তাতেই হয়তো এ সম্পর্কের সার্থকতা। তারপর দুজনে টেলিফোনের দুপ্রান্তে নীরব হয়ে বসে রইলো। দুজন। মধ্যেখানে তাদের মাইল মাইল ব্যবধান। কিন্তু পরস্পরের হৃদয়ে সমবর্তী তারা, দুজনেই।



শামস কবিরের সঙ্গে এক না দেখা নারীর এই টেলিফোনালাপ চলতে লাগলো— উত্থান-পতন, মান-অভিমান, আবেগ ও নিরাবেগের দোলাচলে। দিনের পর দিন। আস্তে আস্তে ব্যাপারটায় বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করে ফেললো শামস কবির। সে এখন চোখ বন্ধ করে কাঙ্ক্ষিত ফোনটায় ডায়াল করতে পারে, তেমনি কাঁধ ও মাথার মধ্যখানে রিসিভার রেখে কথা বলতে বলতে একটা কাজের চিঠি কম্পিউটারে কারেকশন করে ফেলাও তার পক্ষে এখন নিতান্ত সহজ কাজ। অফিসের টেলিফোনেই কথা বলতে হয়, যেহেতু রাতে নীলকে ফোন করা বারণ। সে কারণে রসিক সরকার বা কায়সারকে ঘুষ দেয় সে— এটাসেটা। এই তো গতকাল সে রসিক সরকারকে দিয়েছে এক সেট তাস– খুব দামি তাস। অবশ্য কার্ডগুলোর অন্যাপিঠের ছবিগুলো কেবল প্রাপ্তবয়স্কের জন্য দর্শনীয়। আর কায়সারকে দিয়েছে আমেরিকা থেকে পাওয়া একটা হাতঘড়ি। মা পাঠিয়েছেন— একজন পরিচিত লোক নিউইয়র্ক গিয়েছিল, তার হাতে।

এমন ঘড়িটা শামস কবির দিয়ে দিলো! দিতে পারলো!

হ্যাঁ। প্রধানত মা মা বলে যে অতিরিক্ত ভক্তি বাঙালির, সেটা শামস কবিরের মধ্যে নেই বলে। আর এখন তার হৃদয়ের তুঙ্গ দশা, এ দশায় যে কাউকে সর্বস্ব দান করে দেওয়া যায়, এমনকি রাজা অষ্টম এডয়ার্ডের মতো বিলিয়ে দেওয়া যায় রাজসিংহাসন।

কবিতাও এলো, চারদিক থেকে, পাতার পর পাতা ভরে যেতে লাগলো অক্ষরে অক্ষরে, মনে হলো, যেন ছোট্ট নদীর দুপাশ সন্ধ্যার পর ভরে উঠেছে জোনাকির আলোয় আলোয়।

কিন্তু এই তুঙ্গ দশাও তো একজন মানুষের জীবনে বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। নইলে যে কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষ যুদ্ধে যাবে না, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার

করবে না, নভোচারীরা মাসের মাস কাটিয়ে দিতে পারবে না মহাকাশে।

শামস কবিরের এই ঘোর অবশ্য কাটতেই চাইছে না। তাকে তো আর আমেরিকা আবিষ্কার কিংবা মহাকাশ ভ্রমণ করতে বেরোতে হচ্ছে না। তাকে যা করতে হচ্ছে, তা হলো কবিতা রচনা। একদিন কবিতা লিখতে সুবিধা হবে ভেবেই সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সব আকর্ষণীয় বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। কবিতা লেখার জন্য চাই একটা নিজস্ব ভাষাভূমি– এটা বিশ্বাস করেছে বলেই তো সে আমেরিকা যায়নি, যাওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবে না।

যদিও অফিসের লেখালেখি, অফিসের কাজ ও রীতিনীতি আর তার টেলিফোনালাপ ও কবিতা চর্চার মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব দেখা দিতে লাগলো।

যেমন আজ। নয়ন চৌধুরী ডেকে বললেন, কবির, তুমি প্রতিভাবান ছেলে, সৎ, যোগ্য আর পরিশ্রমী, জীবনে তোমার উন্নতি হবে। আমাদের ব্যবসা দিন দিন বড়ো হচ্ছে। শিগগিরই আমরা টেলিভিশন অ্যাডও বানানো শুরু করতে যাচ্ছি। আমি চাই— এ অফিসটার দায়িত্ব পুরাটাই তুমি নিয়ে নাও। এজন্য তোমাকে অন্যদের চেয়ে বেশি এগিয়ে থাকতে হবে। বেশি পরিশ্রম করতে হবে। লিডারশিপটা নিজে নিজেই নিয়ে নিতে হবে। শুনতে পেলাম, প্রায়ই নাকি অফিস টাইমে তোমার পারসোনাল ফোন আসে। এটা ঠিক না। অফিস টাইমের বাইরে ফোনে কথা বলো। কাজের সময় কাজ করো। বুঝলে ? (নয়ন ভাই খুবই সিরিয়াস। নইলে তিনি পুস্তকের ভাষায় কথা বলছেন কেন ?)

নয়ন ভাই। জরুরি ফোন একটা-দুটো হঠাৎ হঠাৎ অফিসে আসে— তাও আসা যাবে না!

না না। তা বলিনি। কিন্তু অফিসের কাজটা আগে। কই তুমি তো শ্রমজীবী মানুষদের ওপরে লেখাটা কমপ্লিট করলে না? কী করছো তুমি ?

মনটা খারাপ হয়ে রইলো খানিকক্ষণ। দুঃশালা। চাকরিটাই ছেড়ে দিতে হবে। কোনো পত্রিকা অফিসে রাতের শিফটের কাজ নিতে হবে। আর বাসায় নিতে হবে একটা টেলিফোন। পঁচিশ হাজার টাকা নগদ দিলে কালই ফোন দিয়ে যাবে। একটা দালাল রোজই ঘুরঘুর করছে। নগদ তো একটা টাকাও নেই। যা জমেছিল, রেজাকে দিয়ে দিয়েছে লিটল ম্যাগাজিন প্রেস থেকে ছাড়িয়ে আনতে। কবে রেজা বিজ্ঞাপনের বিল পাবে, তারপর শোধ করবে।

এইসব নিয়ে মনখারাপ। তারই মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে চলছে ফোন। দুপুরবেলা লাঞ্চের নামে সে বেরিয়ে যায় ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে। ঘণ্টাখানিক ফোনে কথা বলে। প্রতি তিন মিনেট ৫ টাকা, ৬০ মিনিট ১০০ টাকা। চলে যায়। যাক। কথা বলতে তার ভালো লাগে। কথা না বলে সে তিষ্টোতে পারে না। জীবনটাকে এখন অনেক অর্থপূর্ণ মনে হয়। এ শহরে এমন একটা দরজা কোথায় আছে, যেখানে গেলে কেবল কবিতা নিয়েই আলাপ করা যাবে। কবিতে কবিতে হিংসা-ঈর্ষা-দলাদলি নয়, সাহিত্য পাতার সম্পাদকদের ঘিরে নির্লজ্জ স্তাবকতা নয়, প্রবীণ কবির কাছ থেকে এক লাইনের প্রশংসাপত্র পাওয়ার লোভে তাকে মদ্য ও তৈল প্রদান নয়— কেবল কবিতার জন্য একটুখানি কথা বলা।

বোকাট্টা ঘুড়ির পেছনে পেছনে ছোটে যে বালক, সে যেমন আকাশে ঘুড়ির দিকেই তাকায়, পথ-বিপথ, ক্ষেত-খামার-খানা-খন্দ খেয়াল করে না, শামস কবিরেরও এখন একই দশা। ফোন-ফ্যাক্সের দোকানিটা যে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, তাও সে টের পায় না। রসিক সরকার যে তার কাছ থেকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে, সে গা করে না। কিন্তু নীল যদি একটুখানি রুষ্ট হয়, তার পৃথিবী আঁধার হয়ে আসে, ভুল করে সে যদি কটু কথা বলে ফেলে তার নীলকে, বার বার করে ক্ষমা চায়, চোখের জল ফেলে।

নাহ্। এসব আর অন্যের ফোনে করতে ভালো লাগছে না— এইসব হাসিকান্না আবেগ-উচ্ছ্বাসভরা নাটক। একদিন সে তো রামধরা খেয়েছে, একটা ফোন ফ্যাক্সের দোকান থেকে কথা বলতে বলতে সে দরদর করে কাঁদছে, এ দৃশ্য দেখে ফেলেছেন স্বয়ং নয়ন চৌধুরী। ছি ছি ছি! কী ভাবলেন তিনি!

ঠিক এ সময়ই এলো প্রস্তাবটা। পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে, যদি সে একটা সাত পর্বের রেডিও কথিকা লিখে দিতে পারে খাবার স্যালাইনের ওপর। নয়ন চৌধুরীই কাজটা দিলেন তাকে।

পারবা না কবির ? নয়ন চৌধুরী বললেন তাকে। পাশে তাঁর বন্ধু অনুষ্ঠানটির প্রযোজক বসে আছে।

পারবো। শামস কবির বললো।

এখন কাজের পরিমাণ দাঁড়ালো বেশি। সারা দিন শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে ক্যালেন্ডারের জন্য পরিশ্রম ও গবেষণা দুটোই করতে হয়। বাংলাদেশে জেলের সংখ্যা কতো ? একটা কিছু বানিয়ে লিখলেই তো হলো না। বইপত্র ঘাঁটতে হচ্ছে। এখানে-ওখানে ফোন করতে হচ্ছে। তার ওপর আছে ফটোগ্রাফার [illegible] ভাইয়ের মোটর সাইকেলে চড়ে ফটো তুলতে যাওয়া। সাভারের কুমোরপাড়ায় গিয়েছিল একদিন এবং গিয়ে তার ভালো লাগছিল। শ্রমজীবী মানুষের ওপরের কাজটা তার ভালো লেগে যাচ্ছে। এটা তার চিন্তা ও মনোযোগের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খেয়ে ফেলছে। সে আস্তে আস্তে এই কাজের নেশার জালেও জড়িয়ে পড়ছে।

আবার এলো নতুন কাজ। খাবার স্যালাইনের ওপরে জীবন্তিকা রচনা। সেটা নিয়েও সে ভাবতে শুরু করেছে। তার মগজের কিছু সার্কিট ব্যস্ত হয়ে আছে এ কাজে।

কবিতা লেখায় ভাটা নেমে আসছে। এই নিয়ে টেলিফোনে একটু-আধটু মন কষাকষিও চলছে উভয় পক্ষে। কবিতে ও নীলে।

অ্যাই তুমি গত ক'দিন একটাও কবিতা লেখোনি। এটা ঠিক নয়।

দাঁড়াও না। আর ক'টা দিন সময় দাও। শ্রমজীবী ক্যালেন্ডারটার কাজ শেষ করে নিই।

কবে শেষ হবে এই কাজ ?

আর ১৫ দিনের মধ্যে শেষ না করা হলে নেক্সট ইয়ার আমরা ধরতে পারবো না।

১৫ দিন। সে তো কবে থেকেই বলছো।

না না। ক্যালেন্ডার তো ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যেই ছাপিয়ে ডেলিভারি দিতে হবে। আর দেরি হবেই না।

তারপর আর ওই কাজটা ধরবে না— খাবার স্যালাইনের ?

ধরবো। ও তো আর কঠিন কিছু না। সেজন্য কবিতার ক্ষতি হবে না।

কিন্তু এতোদিন তুমি কবিতা না লিখে থাকবে ?

না, ঠিক তা নয়। তবে কবিতা তো জানোই আমার একমাত্র প্রেম। এর সঙ্গে কোনো সতীন আমি রাখতে চাই না। পুরো সময় ভালোবাসা দিয়ে এ কাজটা করতে চাই।

তাহলে আজই খানিক সময় দাও কবিতাকে। আজ রাতে বসো কাগজ-কলম নিয়ে।

বসতে পারি। হবে না। বুদ্ধদেব বসুর একটা কবিতা আছে— সৃষ্টির মুহূর্ত। কবি লিখেছেন— তার নাম অবসর, তুমি যার স্তব্ধ সমীরণ। অবসর ছাড়া সৃষ্টিশীল মুহূর্ত আসে না। এ কারণে ইদানীং কবিতাও আমার কাছে আসছে না।

কী জানি বাবা, আমার কিন্তু ব্যাপার ভালো লাগছে না।

শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে গবেষণার কাজটায় কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছি। কতো নতুন তথ্য জানতে পারছি এদের সম্পর্কে। কতো বিচিত্র মানুষের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে!

তোমার ভালো লাগছে ?

হুম। মানুষকে জানার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে জানো।

তাই ?

হুম। শুধু তোমাকেই জানা হলো না। তুমি কে, তোমার আসল নামটাই বা কী— আমি জানি না।

বলেছি না, ওটা জানলে তো সব রহস্যই শেষ হয়ে যাবে। কবিতার জন্য না খানিক রহস্য লাগে।

আচ্ছা, এটা অন্তত বলো, পৃথিবীতে এতো কবি-লেখক থাকতে তুমি আমাকে ফোন করলে কেন ?

এই তো একটা কথা বললে। অবশ্য তোমার প্রশ্নটা নিয়ে আমি যে ভাবিনি, তাও নয়। ভেবেছি। আসলে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কবি আছেন, যারা ভালো লেখেন। তারা খ্যাতিমান। কাজেই তাদের অনেক পাঠক আছে। পাঠিকাও আছে। আমি চেয়েছিলাম এমন একজন কবি— যে সাংঘাতিক ভালো লেখে, কিন্তু তাকে কোনো ভক্ত পাঠিকা এখনো কব্জা করতে পারে নি। ধরো তুমি গেলে কক্সবাজারে। ওখানে পর্যটনের সৈকতে তো সবাই যায়। কিন্তু এমন একজন-দুজন মানুষ কি পাওয়া যাবে না, যে খুঁজে বের করবে এমন একটা নির্জন জায়গা, যে সৈকতে সচরাচর কেউ যায় না— একেবারেই নিরিবিলি।

হুম। কিন্তু আমার যে কোনো ভক্ত পাঠক নেই, বিশেষ করে কোনো পাঠিকা নেই, এমনকি নেই বিশেষ কোনো নারী— এটা তুমি জানলে কী করে ?

জেনেছি। তবে ওই তথ্য নয়, তোমার কবিতাই আমাকে বাধ্য করেছে তোমাকে ফোন করতে। এটা কেন হলো, তা আমি বলতে পারবো না। এটা যে হয়েছে, এতোটুকুনই কেবল বলতে পারি আমি।

তাতে ভালো না মন্দ হলো ?

তুমি বলো। তুমি কবি। বলার অধিকার তোমার।

আমার জন্য হয়েছে নবজীবন লাভ। পুনরুজ্জীবন। কিংবা আমি ছিলাম মর্চে পড়া পেরেক। তুমি স্পর্শ দিয়ে জাগিয়ে আমাকে মানুষ করেছো।

করেছি। কী জানি বাবা। তুমি তো ইদানীং লিখছো না।

লিখছি না। তবে লিখবো বলে প্রস্তুত হচ্ছি।

দেখা যাক! নীলিমা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।



চোখ মেলতে পারছে না শামস কবির। মাথায় অসম্ভব ব্যথা। শীত লাগছে। গায়ে কম্বল মুড়িয়েও আরাম লাগছে না— এতো শীত। শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে। মনে হয় জ্বর এসেছে। কে জানে, কতো জ্বর। অতিকষ্টে ডান হাতটা নিজের কপালে রাখে সে। মাপবার চেষ্টা করে জ্বরের পরিমাণ। বুঝতে পারে না। শুধু জ্বর আর মাথাব্যথা হলেও হতো। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে। মনে হয় এসিড বার্ন করছে। জোরে জোরে শ্বাস নেয় সে। হাত-পা কাঁপছে। বমি হবে নাকি। হয়ে গেলেই তো মিটে যায়। উফ্‌ফ্‌! অসহ্য। মনে হচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণা। বেঘোরে আবার ঘুমের গভীরে চলে গেলো শামস কবির। হয়তো তার হুঁশ নেই ঠিকমতো।

সকালবেলা কাজের বুয়া এলো। সিঁড়ি দিয়ে এ ফ্লোরে ওঠার পরই একটা গেট আছে। ছাদে আসার এবং শামস কবিরের ঘরে আসার। সেই গেটটাও বন্ধ। আবার শামস কবিরের ঘরের দরজাও বন্ধ।

ভাইজান, ও ভাইজান— বৃদ্ধা বুয়া সকাল সাড়ে সাতটায় এসে গেটে ধাক্কা দিলো। ভাইজান সাড়ে আটটায় বেরিয়ে যায়। সকালের নাশতা হিসেবে তাকে দুটো রুটি বেলে সেঁকে দিতে হয় বুয়াকে। এ কাজ করে বুয়া চলে যায় অন্য বাড়িতে। এ বাড়িতে আসে বিকেলে। তার আঁচলে ছাদের গেটের চাবি আছে। চাবি দিয়ে গেট খুলে সে সোজা চলে যায় রান্নাঘরে। ভাইজানের জন্য রাতের খাবার রাঁধতে বসে। বাজার কেনাকাটা সব বুয়াই করে।

ভাইজান, ও ভাইজান— বুয়া বহুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি, চেঁচামেচি করলো। শেষে বিরক্ত হয়ে চলে গেলো অন্য বাড়িতে।

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙলো শামস কবিরের। ইতিমধ্যে সে বমি করে মেঝে ভাসিয়ে রেখেছে। বালিশের কাছ থেকে হাতঘড়িটা যে নিয়ে দেখবে ক'টা বাজে সেই শক্তিটুকুনও নেই!

আমি এই ঘরে একা। দরজা বন্ধ। আমি মরে গেলে এইখানে একাকী মরে যাবো। বাঁচতে হবে। শামস কবির মনকে শক্ত করছে। তাকে উঠতে হবে। ঘরটা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। ডাক্তার ডাকতে হবে এবং ওষুধ খেতে হবে। এমনই এক চিলেকোঠার ঘরে একাকী নিঃসঙ্গ মৃত্যু, করুণ হলুদ প্রাণহীন হা-করা মুখে উড়ন্ত একটা মাছি— না, এই দৃশ্য তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। ওঠো, শামস কবির, উঠে বসো। সে নিজেকে পরামর্শ দেয়।

কাল যখন তারা সোনারগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল তখনই তার শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। দুটো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সে একসঙ্গে খেয়ে নিয়ে ভেবেছিল— ও কিছু না, সেরে যাবে। টিংকু ভাইয়ের মোটর সাইকেলের পেছনে ছিল সে। তারা গিয়েছিল একজন বাউলের খোঁজে। অন্ধ বাউল। একতারা বাজিয়ে গান করেন। বিচিত্র পেশার একটা হিসেবে বাউল পেশাকেও চালিয়ে দেওয়া যায়। শুধু চালিয়ে দেওয়া যায় বললে ভুল বলা হবে। রীতিমতো আকর্ষণীয় ব্যাপার হবে। সুতরাং আলোকচিত্রী টিংকু ভাইয়ের মোটর বাইকের পেছনে উঠে বসে সোনারগাঁওয়ের দিকে চলে আসাটা তার কাছে আনন্দদায়ক ব্যাপারই ছিল।

শরীরটা ভালো নয়— যুবাবয়সী কারো কাছে এটা শোনা হাস্যকর। শামস কবির ব্যাপারটা পাত্তাই দিতে চায় নি। কিন্তু ফেরার সময় হঠাৎ করেই শুরু হলো বৃষ্টি। মটরসাইকেল থামিয়ে তারা দাঁড়ালো একটা গাছের নিচে। কিন্তু তাতেও কুলোলো না, তারা ভিজেই গেলো। ভিজে যখন গেলাম, তখন আর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা কেন। চলুন যাওয়া যাক। আবার শুরু হলো মোটরসাইকেল যাত্রা। বৃষ্টির সঙ্গে বইছে শীতল বাতাস। চলন্ত মোটরসাইকেলের পিছে বসে ঠাণ্ডাটা হাড়ে হাড়ে টের পেলো শামস কবির। তাও কষ্টটা এতো বেশি হতো না, যদি সায়েদাবাদ যাত্রাবাড়ীর যানজটটা এতো তীব্র না হতো। প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি হলো এই যানজটটুকু পার হতে।

বাসায় এসে চুলায় এক পাতিল পানি চড়িয়ে দিয়েছিল শামস কবির। গরম পানিতে একটা গোসল দিলেই সবটা সেরে যাবে— আশা ছিল। কিন্তু কই, লাভ তো হলো না। কাল রাতে শোবার সময়ই হাত-পায়ে ছিল প্রচণ্ড ব্যথা— শরীরটা যেন চলতেই চাইছিল না।

আর আজ এখন এই অবস্থা। উঠতেই পারবে না বলে মনে হচ্ছে। হয়তো এখানেই মরে পড়ে থাকতে হবে। মনের শক্তিই হলো আসল শক্তি। উঠতেই হবে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিছানায় অতিকষ্টে উঠে বসলো শামস কবির। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো— দুলে উঠলো সমস্ত ঘরদোর জানালা। সে বিছানাটা খামছে ধরলো দু'হাতে। 'মাগো'— নিজের অজান্তেই সে মাকে ডাকলো। ডাকতে মনে হয় ভালোই লাগছে। সে আবার ডেকে উঠলো— 'মাগো, মাগো। মা মা। তুমি কোথায় মা।' তার দু'চোখ গরম পানিতে ভাসছে।

মনে পড়লো, ছোটবেলায় জ্বর হলে মা কীরকম অস্থির হতেন! সারারাত বুকে আগলে রাখতেন— মা একটু চোখের আড়াল হলেই যেন জ্বর লাই পেয়ে যাবে।

মা, মা। এবার সে মায়ের কাছে যেন শান্তি প্রার্থনা করলো। পা নামিয়ে দিলো মেঝের দিকে। দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। মেঝের বমিতে পা মেখে যাচ্ছে—

যাক। খানিক দম নিয়ে সে সোজা চলে গেলো দরজার কাছে, ছিটকিনিটা খুললো। তারপর একই গতিজড়তা দিয়ে চলে গেলো গেটের কাছে। দরজার ছিটকিনিটা খুললো। যাক, এবার সে মরে পচে থাকলেও লোকদের দরজা ভাঙার ঝক্কি পোহাতে হবে না।

না। আর পারছে না সে। দেয়াল ধরে ধরে ফিরে এলো ঘরে। বাথরুমে গেলো। তারপর সোজা বিছানায়। আরেক ঘুমে পুরো সন্ধ্যা।

বুয়া এসেছে। রান্নাঘরে খটখট আওয়াজ হচ্ছে। সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলো, বুয়া, বুয়া, এদিকে আসেন। নাহ্। এই ডাকে হবে না। আরো জোরে ডাকতে হবে। গলার জোর বাড়িয়ে দিলো সে। বুয়া, বুয়া।

জি ভাইজান।

বমি করেছি। কষ্ট করে একটু সাফ করেন। আর সামনের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ আনেন। গিয়ে বলেন, খুব জ্বর, মাথাব্যথা। গায়ে ব্যথা। বমি। কোন ওষুধ কীভাবে খাবে লিখে নিয়ে আসবেন। দ্যান। মানিব্যাগটা দ্যান।

বুয়া ওষুধ আনলো। প্যারাসিটামল। আর স্টেমিটিল। দূর। এন্টিবায়োটিক দরকার। একটা ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

বুয়া বেশ বয়স্কা। দাঁত নেই কতোগুলো। তবুও পান খাওয়ার বিরাম নেই। বিড়িও খায়। কিন্তু মহিলা ভালো। পরদিন সকাল সকাল এসে হাজির। আজ অবশ্য বাইরের গেট খোলাই ছিল। বুয়া এসে ভাইজান ভাইজান বলে ডাক পাড়লো, শামস কবিরের ঘুম ভেঙে গেলো। বুয়া বললো, হাতমুখ ধোন। দুইটা গরম রুটি খান। প্যাট খালি থাকলে কামড়ায়। প্যাট ভরান দরকার।

রুটি খেলো শামস কবির। চাও খেলো। বুয়াকে বললো, বুয়া, আমাকে ধরে নিচে ওষুধের দোকানে চলেন। নইলে মনে হয় মরেই যাবো।

ভাইজানের যতো কুকথা! বুয়া আপত্তি জানালো। খানিক পর সাড়ে ন'টার দিকে বুয়ার হাত ধরেই চারতলা থেকে নেমে নিচের ওষুধের দোকানে এলো শামস কবির। কম্পাউন্ডারকে বললো, জ্বরের এন্টিবায়োটিক দ্যান।

কট্রিম দেবো।

জ্বরের ?

হ্যাঁ।

দ্যান। একটা ফোন করবো।

সে ফোন ঘোরালো। হাতের আঙুলের তো সবকিছু রপ্ত করাই আছে। ফোন বেজে উঠলো ওই পারে। হ্যালো নীল।

কী হয়েছে তোমার ? গলা এমন শোনা যাচ্ছে কেন ?

খুব খারাপ অবস্থা। মৃত্যুর সাথে লড়ছি। শোনো অফিসেও একটু খবর দিয়ে দিও।

আচ্ছা ঠিক আছে। এখন কোথায় তুমি ?

ওষুধের দোকানে।

আচ্ছা ঠিক আছে। বাসায় যাও। ওষুধপাতি খাচ্ছো ?

হ্যাঁ এন্টিবায়োটিক কিনলাম। আর তোমার সঙ্গে কথা হলো— এটা হলো প্রাণরক্ষাকারী ওষুধ।

ঢং। শোনো তোমার বাসার ঠিকানাটা বলো তো। শামস কবির ঠিকানা বললো।

ওপার থেকে নীল বললো, শোনো। এন্টিবায়োটিকটা একটু পরে খাও। ডাক্তার না দেখিয়ে খাওয়াটা ঠিক নয়। দেখি আগে একটা ডাক্তার পাই কি-না।

তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বাঁচবো।

আরে মরার কথা আসছে কোত্থেকে। যাও এখনই ঘরে যাও, শুয়ে পড়ো।

ফেরার পথে মনে হলো, আর শরীর চলছে না। একবার সিঁড়িতেই বসে পড়লো শামস কবির। আবার উঠলোও। বুয়াটা যে ভালো, তার প্রমাণ— চিল্লাচিল্লি করলো না, ডেকে লোক জড়ো করলো না— বললো, খানিক দম নেন। ফির ওঠেন।

ঘরে এসেই সটান শুয়ে পড়লো শামস কবির।

কতোক্ষণ শুয়েছিল খেয়াল নেই। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল। অর্থহীন ছেঁড়াখোঁড়া স্বপ্ন। দিনাজপুরের রামসাগরের তীরে বেড়াতে গেছে। উঁচু পাড়, বাঁধানো সিঁড়ি। সে নিচে নামছে। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখলো একটা মেয়ে। চিনতে পারলো। তানিয়া। তানিয়া শুধু সায়া-ব্লাউজ পরা। বাতাসে তার সায়া ফুলে উঠেছে। নিচ থেকে ওপর দিকে তাকিয়ে তানিয়ার এ অবস্থা দেখে খুবই লজ্জা পেলো শামস কবির।

ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুমের ভেতর থেকে জাগৃতিতে ফিরে আসতে তার ধন্দ লাগছে। তার কপালে যেন কার হাত। সে চোখ মেলে বোঝার চেষ্টা করছে হাতটা কার ?

একটা পুরুষ কণ্ঠ বললো, আপনি শামস কবির।

হ্যাঁ। বললো সে।

আমি ডাক্তার ইকবাল। আপনার বন্ধু নীল আমাকে পাঠিয়েছে।

আচ্ছা। বসেন। শামস কবির উঠে বসার চেষ্টা করছে।

ব্যস্ত হবেন না। শুয়ে থাকুন। ডাক্তার বললেন।

ডাক্তারটি তরুণ। হাল্কা-পাতলা। কিছু চেহারা থাকে যাদের দেখলে মনে হয় পুরনো পরিচিত। যেন সব সময়ের হিতাকাঙ্ক্ষী, ডাক্তার ইকবালও তেমন।

আপনাকে কোথায় দেখেছি ? শামস কবির বললো।

দেখে থাকবেন কোথাও। ঢাকাতেই যখন থাকি— ডাক্তার বললেন।

কী জানি, খুবই চেনা চেনা লাগছে।

হবে হয়তো। টেলিভিশনে দেখে থাকতে পারেন ?

আপনি টেলিভিশন অনুষ্ঠান করেন ? তাই হবে।

ডাক্তার তাকে ভালো করে দেখলো। তারপর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলো। বললো, আপনার তো ওষুধ কিনে দেওয়ারও কেউ নেই। ঠিক আছে, আমিই এনে দিচ্ছি।

না না লাগবে না। বুয়া আনতে পারবে।

বুয়া কখন আসবে ?

এই তো খানিক পর। দুপুরের ভাত রাঁধতে।

আচ্ছা। ঠিক আছে তা হলে...। আমি আসি।

আপনার ভিজিট... কিছু মনে করবেন না...।

আমাকে আঘাত দেবেন না। সবার কাছে আমি ভিজিট নেই না।

ধন্যবাদ আপনাকে।

ঠিক আছে। ভালো হয়ে উঠুন। আবার দেখা হবে। পরে আমি আরেকবার আসবো খোঁজখবর নিতে।

ডাক্তার চলে গেছে। বুয়া এখনো আসেনি। রোগযন্ত্রণায় কাতর শামস কবির পড়ে আছে বিছানায়। ছাদের দিকে মুখ করে। সমস্ত চরাচরকে তার বেদনারিক্ত মনে হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করে খানিকটা সাহস ফিরে পেলো শামস কবির। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ বই থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তীব্র ব্যথাতেও কাতর হয়ে পড়তেন না। তিনি মনকে শক্ত করতেন। ব্যথা করছে না— ওই জায়গায় ব্যথা নেই— তিনি তার মনোযোগ অন্য কোথাও কেন্দ্রীভূত করতেন। এরপর আর ব্যথা অনুভব হতো না।

নীলের কথা মনে করার চেষ্টা করলো শামস কবির। কে এই মেয়েটা? দেখতে কেমন সে ? বয়স কতো ? কোথায় থাকে ? নীল, নীল... সে তার নাম জপ করতে থাকলো বিড় বিড় করে।

ঠিক তখনই ভেজানো দরজা খুলে গেলো। একটা নারীছায়া এসে বসলো তার শিয়রের পাশে। হাতে হাত রাখলো, অন্য হাতটা দিলো কপালে— বললো, জ্বর তো অনেক কবি।

কপালের হাতটাকে নিজের হাত দিয়ে টেনে নিলো শামস কবির। নিজের চোখে ধরলো। আবেগের আতিশয্যে তার দু'চোখ বেয়ে জল আসছে।

বলে দেবার দরকার নেই— নীল এসেছে। তারপর হাতটা নিজের মুখে ধরলো। চুমু খেলো। বললো, নীল আমার নীল...

নীলেরও চোখে জল এসে গেছে। সে আবেগে কাঁপা গলায় বললো, কবি, অস্থির হয়ো না, তোমার যে জ্বর।

জ্বর সেরে গেছে। আমি ভালো হয়ে গেছি। তুমি এসেছো। তোমার ছোঁয়া পেয়েছি। আমি ভালো হয়ে গেছি— শামস কবির বললো। তারপর উঠে বসার চেষ্টা করলো।

উঠতে হবে না। শুয়ে থাকো। শুয়ে থাকো।

না। আমি বুঝি তোমাকে দেখবো না।

শামস কবির উঠে বসলো। সোজা পারস্পেকটিভ থেকে সে নীলকে দেখতে চায়।

কবির কল্পনা দিয়ে সে এতোদিন নীলকে দেখেছে, নীলের চেহারা ও গড়নের একটা কাল্পনিক মূর্তি দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু বাস্তবের নীল অনেক বেশি সুন্দর। অনেক অনেক

সুন্দর। একহারা গড়ন, সূঁচালো নাক, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করছে, চোখের নিচে সামান্য কালি, আর দুটি অশ্রুবিন্দু। মাথাভরা লম্বা চুল, মধ্যখানে সিঁথি। হাল্কা নীল রঙের জামা পরেছে সে, শাদা পায়জামা।

তুমি খুব সুন্দর! হবেই তো! তুমি তো দুনিয়ার নারী নও। তুমি অন্য জগতের। অন্য গ্রহের। স্বর্গের।

জ্বর বেশি মনে হচ্ছে। বেশ বকছো।

না না। জ্বর সত্যি ভালো হয়ে গেছে। থ্যাংকস টু জ্বর। জ্বর না হলে কি আর তুমি আসতে ?

পাগল। আমার পাগলা কবি। তুমি আমাকে বেশি বেশি দাম দিও না। আমি তার যোগ্য নই।

তুমি তো আমার সর্বস্ব। তোমার কোনো দাম হয় না। তুমি অমূল্য।

তুমি আমাকে ভালোবাসো কবি ?

খুব। খুব ভালোবাসি।

আচ্ছা। এতো বকতে হবে না। প্রেসক্রিপশনটা কই ? দাও। তোমার জন্য ওষুধ নিয়ে আসি।

না না। তুমি যেও না। বুয়া এলে বুয়াকে পাঠালে। তুমি আমার পাশে থাকো। ওষুধ আনানোর জন্য তোমাকে হারাতে চাই না।

পাগলামি করো না। আমি হারিয়ে যাচ্ছি না।

নাহ্। তুমি বসে থাকো। তুমি আমার হাত ধরে বসে থাকো।

শামস কবির নীলকে ছাড়লোই না। নীল তার কবিকে শুইয়ে দিলো। শিয়রের কাছে বসে বললো, আমি তোমার চুলে বিলি কেটে দিই। তুমি ঘুমোও।



আজ সকাল থেকেই শামস কবিরের অস্থির অস্থির লাগছে। আজো নীলের আসার কথা। কখন আসবে সে। আসবে তো। গতকাল যে সে এলো, আর শামস কবির তার হাত ধরে চুমু দিলো— এসব কথা এখন অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। আসলেই কি ঘটনাটা ঘটে গেছে। নাকি সে সবই স্বপ্ন দেখেছে। জ্বরের ঘোরে কল্পনা করেছে মাত্র।

পেটে তোমার কাল থেকে এন্টিবায়োটিক পড়ছে। তা ছাড়া জ্বরের ওষুধ, বমির ওষুধ খাচ্ছো। অতো কাহিল-কাহিল ভাব দেখাচ্ছো কেন ? ওঠো ঘরদোর একটু গোছাও। আজো তো সে আসবে। তার জন্য তোমার কি একটুও তৈরি হওয়া উচিত নয়।

শামস কবির বসলো। নাহ্, শরীর খুবই দুর্বল। তার পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। নইলে মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বইপত্রগুলো সে গুছিয়ে রাখতো ঠিকই। নিচে দোকানে কি ফুল পাওয়া যাবে? নাহ্, একেবারে মগবাজার চৌরাস্তা ছাড়া ফুলের দোকান নেই। নিজের গালে হাত দিলো। গাল ভর্তি দাড়ি। পরনে বাসার পাজামা। একটু ভালো কাপড়-চোপড় তো অন্তত তার পরে থাকা উচিত। বুয়া আসুক। বুয়াকে দিয়ে ঘরদোরটা গুছিয়ে নেবে। বুয়াকে পাঠালে কি ফুল কিনতে পারবে এক গোছা? নাহ্, বুয়াকে দিয়ে ফুল কেনানোটা সুন্দর দেখায় না। সে পারবে কি? খুবই মুশকিলের ব্যাপার হলো তো। ঘরে তো মানুষ ঘরের কাপড়-চোপড়ই পরা থাকবে। কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ অতিথি যদি ঘরে আসেন, তখন? তার জন্য হয়তো বাইরের কাপড়-চোপড়ই পরা যায়।

সময় আর কাটতে চায় না। ইস, কখন ন'টা-দশটা বাজবে? কখন নীল আসবে? কখন? বুয়া এলো। শামস কবির তাকে বললো গরম পানি দিতে। সে গোসল করবে। পরিচ্ছন্ন হবে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরবে। বুয়া গরম পানি দিলো। ঘরদোর সাফসুতরো করে দিলো। হ্যাঁ, এখন নিজেকে আর ঘরটাকে পাতে দেবার মতো লাগছে বটে!

বুয়া চলে গেলো। আবার নিস্তব্ধতা। ক্লান্তও লাগছে নিজেকে। শামস কবির ফের শুয়ে পড়লো বিছানায়। খানিক দম নিলো। আবার উঠলো। জানালার ধারে গেলো। এখান থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। কই, নীলের দেখা তো নেই!

আবার শুয়ে পড়লো।

হ্যাঁ, পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। স্যান্ডেলের হিলের শব্দ। সে আসছে। বুকের মধ্যে টিপ টিপ... শব্দটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, জোরালো হচ্ছে।

শামস কবির বিছানা ছেড়ে উঠলো। দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

নীল এসেছে। কমলা রঙের একটা শাড়ি পরে এসেছে। চুল ছেড়ে দেওয়া। দরজায় এসে সে চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালো। পেছন দিক থেকে আলো এসে তাকে মোহনীয় করে তুলছে।

শামস কবির খানিক পিছিয়ে তার দিকে তাকালো। নীলের এক হাতে একটা ফুলের ঝুড়ি।

এই দৃশ্যে অমরতা! এই দৃশ্যে সময় স্থির হয়ে থাকতে পারে। সব ভুলে শামস কবির নীলকে দেখছে।

এই, আমাকে ঘরে ঢুকতে ডাকবে না? বসতে বলবে না?

শামস কবির কাছে গেলো। নীল ফুলের ঝুড়িটা দিলো তার হাতে। সেটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে শামস কবির ধরলো নীলের হাত। এসো।

টেনে নিয়ে গেলো তাকে। বিছানায় বসালো। ফুলের তোড়াটা রাখলো মেঝেতে।

এতো দেরি করলে কেন? ভেবেছিলাম আসবেই না— শামস কবিরের চোখ ছলোছলো।

পাগল। শাড়ি পরলাম যে। শাড়ি পরলে সাজতে-গুজতে হয়। তাই দেরি হয়ে গেলো। আমাকে এ শাড়িতে কেমন লাগছে বললে না।

খুব সুন্দর! খুব সুন্দর! পরীর মতো সুন্দর। কমলাসুন্দরী— বললো শামস কবির।

দ্যাখো, তোমার জন্য কী এনেছি— ব্যাগ থেকে একটা মোড়ক ঢাকা উপহার বের করলো নীল।

কী ভেতরে?

খুলে দ্যাখো।

শামস কবির মোড়ক খুললো। একটা বই। কবিতার।

থ্যাংক ইউ— বললো শামস কবির। তুমি আমাকে এতো কিছু দিচ্ছো, আমি শোধ দেবো কী করে?

শোধ দেওয়ার কথা আসছে কোত্থেকে— অভিমানাহত শোনালো নীলের কণ্ঠস্বর।

খানিকক্ষণ নীরবতা। অস্বস্তিকর। পারদের মতো ভারী। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলো শামস কবির—। ব্যাপারটা অনেকটা ওই ব্যাঙ আর রাজকন্যের মতো। আমি তো এক কুচ্ছিত ব্যাঙ ছাড়া অন্য কিছু নই। তোমার মতো একজন মেয়ে— শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, আমার কাছে যে এসেছে— এই তো অনেক।

কেন এমন করে বলছো। তুমি কে, তুমি নিজেও জানো না। শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন এবং হ্যান্ডসাম। মেয়েরা তোমার জন্য ছোকছোক করবে। তোমার বউয়ের কপালে বড়ো দুঃখ আছে— তোমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে গিয়ে বেচারীর অবস্থা যা হবে না! আর তোমার আছে অন্য এক প্রতিভা— কবিত্ব। সেটা তো আর দশজনের থাকে না। তুমি তো সাধারণ নও। অসাধারণ। আমি হলাম একটা যা-তা মেয়ে। হেজিপেজি ধরনের। তোমার তুলনায় আমি— যা-তা। তুমি যে আমাকে এ পর্যন্ত আসতে দিয়েছো, এটাই আমি আমার পূর্বজন্মের পুণ্য বলে জানি। এই কী যা-তা বক বক করছি। তুমি বিশ্রাম নাও।

বিশ্রাম কি আর নেওয়া হয়। চুপচাপ শুয়ে থাকলো শামস কবির। নীল ঘরদোর গোছাতে লাগলো। বললো, তোমার একটা টেবিল-চেয়ার আর আরেকটা বইয়ের র‍্যাক লাগবে। বইপত্র নষ্ট হয়ে যাবে তো নইলে। মেঝেতো ড্যাম্প।

খানিকক্ষণ গিন্নিপনা করে সে বিদায় নিলো।

এমনই করে দিন যাচ্ছে। নতুন ঘটনা তো আর তেমন কিছু ঘটেনি। শুধু একটিমাত্র ঘটনা ছাড়া। জ্বরটা এখন আর আসছে না। তখন, একদিন, শামস কবিরের বাসাতেই দুপুরবেলা পাশাপাশি দুজন বসে আছে। শামস কবির নীলের হাতের চুড়িগুলো নিয়ে খেলছে। তারপর নীলের গলার চেনটার দিকে নজর গেলো তার। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। নীল কিছু বলছে না। তার নাকের ডগায় ঘাম।

শামস কবির বললো, এই নীল, তোমাকে একটা চুমু দিই। জানো, কোনোদিন কোনো মেয়েকে চুমু খাইনি। যদি রাজি হও, এটা হবে জীবনের প্রথম চুমু।

নীল কথা বলছে না। তার মুখে বউ বউ ধরনের লজ্জা। নীলের দু'ঘাড়ে হাত রাখলো শামস কবির। গলাটা পেঁচিয়ে ধরলো। তাকে কাছে টানলো। নিজের ঠোঁট দুটো বাড়িয়ে দিলো। ওর দুটো ঠোঁটই নিলো নিজের দু'ঠোঁটের মধ্যে। ব্যস। চুমু খাওয়া হয়ে গেলো। জীবনের প্রথম চুম্বন। এতো সহজ ব্যাপারটা! আকাশ-বাতাস গোলাপি হয়ে গেলো, রুমঝুম সঙ্গীত বাজলো না কোথাও।

খানিক পর নীল বললো, কবি, আমি আসি।

আজ এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবে? কিছু মনে করেছো নাকি?

নাহ্।

তাহলে?

না কবি। আমি তো তোমার যোগ্য নই। তুমি এতো ভালো একটা ছেলে। আমার সঙ্গে জীবনটাকে জড়িও না। ঠিক যেন তোমার-আমার সম্পর্কটা সংসারের পাঁকে না জড়ায়। যেন একটু অন্যরকম— ধরো যাকে বলে পবিত্রতা...

হয়েছে, হয়েছে। একটা চুমু দিয়েছি বলে এতো কথা! জানো না নির্মলেন্দু গুণের ওই কবিতাটা—

তুমি চুম্বন ফিরিয়ে দিয়েছো, তুমি পাপী,
ফুলের উপমা শুনে ফিরিয়ে নিয়েছো মুখ,
তুমি দুঃখী হবে, পাপ আর দুঃখ দিয়ে তোমার
সংসার হবে বাঁধা।

নির্মলেন্দু গুণ ভালো লেখেন, না?

হুম।

এই আজ আমি যাই। তুমি কাল থেকে অফিসে যাচ্ছো তো?

হ্যাঁ, একবার ঘুরে আসি অন্তত।

পরদিন অফিসে গেলো শামস কবির। ...রন ভাই তো তাকে পেয়ে মনে হলো আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কবির তুমি আসছো। তোমার জন্য আমি দরগায় শিরনি মানত করছি। যাক বাবা। আস্তে আস্তে কামে লাইগা পড়ো। জানুয়ারিতে তোমারে আমি সিঙ্গাপুর পাঠাবো। পুরা বডি চেকআপ করে আসবা।

আস্তে আস্তে অফিসের কাজের ব্যস্ততা গেলো বেড়ে। নীলের সঙ্গে কথা বলাটাও চললো অব্যাহত গতিতে। তবে বাসাওলায়ার কাছ থেকে কঠোর নোটিস পাওয়া গেছে— কোনো রকম মহিলা অতিথির প্রবেশ নিষেধ। এ কদিন অসুস্থ ছিলে, দেখার লোক ছিল না, গেস্ট এসেছে, কিছু বলিনি। এরপর যদি কাউকে এ বাড়িতে আসতে দেখা যায়, স্ট্রেইট পুলিশে ধরিয়ে দেব।

ফলে দেখা-সাক্ষাৎ দুজনের তেমন হয় না। কিন্তু কথা হয়। কথায় কথায় শামস কবির জানতে পারে নীলের তার প্রতি আকৃষ্ট হবার রহস্য।

বললো, আমার এক বন্ধু ছিল। বন্ধু মানে বান্ধবী। সে পড়তো তোমাদের ডিপার্টমেন্টে। তোমাদের দু'ব্যাচ জুনিয়র। সে তোমার ভীষণ ভক্ত ছিল। ভক্ত মানে ভক্ত, তোমার জন্য সে দিওয়ানা হয়ে পড়েছিল। সে আবার আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ফলে তোমার প্রশংসা শুনতাম তার মুখ থেকে, অনেকবার। তোমাদের ডিপার্টমেন্টের অনুষ্ঠানে তুমি কবিতা পড়ছো, সেই ছবি ছিল তার কাছে— আমাকে সে দেখাতো। তোমাদের সমাপনী উৎসবে

যে স্মরণিকা বেরিয়েছিল, তাতে তোমার একটা উত্তম কুমার মার্কা ছবি ছিল— আর ছিল তোমার একটা কবিতা— সেসব আমার কাছে এনে জমা রাখতো। তোমার কবিতা বেরোলে সেই পত্রিকাটাও চলে আসতো আমার কাছে। কিন্তু ওই মেয়েটার সব ভালো ছিল। শুধু একটা জিনিস ছাড়া। ও কবিতা বুঝতো না। বুঝতে চাইতো না। আমি আবার আবৃত্তির দল করতাম-টরতাম বলে কবি আর কবিতার সাংঘাতিক ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

ওই মেয়ের নাম কী?

না। নাম বলবো না। মাথা খারাপ!

তারপর কী হলো?

ওই মেয়ে অচিরেই আরেকটা ছেলের প্রেমে পড়ে গেলো। ছেলেটা ক্রিকেটার।

বাহ্।

আর তোমার কবিতা পড়তে পড়তে আমি তোমার ভক্ত হয়ে গেলাম।

বলো কী!

কিন্তু আমার অহঙ্কার ছিল। যে আমি আমার বন্ধুটির মতো তারকার প্রেমে পড়ি না। আমি হলাম আসল গুণের সমঝদার। আমি কবিতাকে ভালোবাসি। কবি, সে ওই কবিতার লেখক বলে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কোনো কারণে নয়।

সর্বনাশ।

এ কারণেই তোমাকে আমি বলি, আমাদের সম্পর্কটা কিন্তু অন্যসব সম্পর্কের মতো হবে না। কিছুদিন গল্পটল্প করে তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়া— অ্যা, ছ্যা।

তাহলে। কী হবে?

তুমি কবিতা লিখবে। কবি হবে। কবির জীবন যাপন করবে। কবিতার জন্য দরকার হলে সবকিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে। আর আমি দূর থেকে তোমাকে যাকে বলে প্রেরণা, তা দিয়ে যাবো।

কিন্তু আমি যে জড়িয়ে পড়ছি।

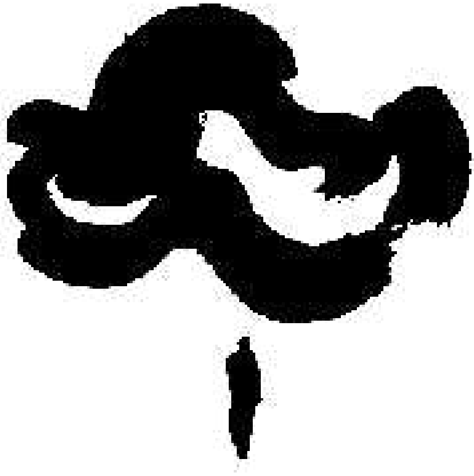
জড়ায়ে আছে বাঁধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই।

আমার যে লোভ হচ্ছে।

শিল্পীকে তো এসবের ওপরে উঠতেই হবে।

লেকচার দিচ্ছো কেন?

জানি না। জানি না। ধৃষ্টতা, সব আমার ধৃষ্টতা— নীলের কণ্ঠস্বরে দীর্ঘশ্বাস।



দিন যায়। শামস কবিরের ব্যস্ততা বেড়ে যাচ্ছে। নানা ধরনের পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ আসছে তার কাছে। প্রধানত বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি। রেডিও ও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের জন্য 'জিংগেল'। পণ্যের গুণগান গেয়ে দু'চার পঙক্তি রচনা করা। নিজের লেখা কথায় যখন সুর পড়ে, যখন সেই সঙ্গীতই চিত্রায়িত হয়, টিভি পর্দায় মূর্ত হয়ে ওঠে মডেলদের নানা ভঙ্গিতে; সত্যি কথা বলতে কি, শামস কবিরের খারাপ লাগে না। সে এইভাবে জড়িয়ে পড়ছে নানা কিছুর সঙ্গে— যা তাকে দিচ্ছে পরিচিতি। সমাজের নানা লোকের কাছে বেড়ে যাচ্ছে তার গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তা, টাকা-পয়সাও আসছে একটু-আধুট করে— এবং সে বুঝতে পারছে একটু একটু করে সে তলিয়ে যাচ্ছে। আর এই নিমজ্জনটা বিপজ্জনক জেনেও সে উদ্ধারের জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি কিংবা হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছে না।

নয়ন ভাইও তার ওপর নির্ভরতা দিয়েছেন বাড়িয়ে। শুধু যে বিজ্ঞাপনের স্ক্রিপ্ট সে দেখে দেয় তা নয়, প্রিন্ট মিডিয়ার বিজ্ঞাপনগুলোর নকশাও ইদানীং সে প্রস্তাব করে, অনুমোদন করে, আর্টিস্টদের কাজ দেখে গম্ভীর মুখে বাতিল করার নির্দেশ দেয়।

পিএবিএক্স ফোনটা বেজে উঠলো। শামস কবির কম্পিউটারে একটা বিজ্ঞাপনের কপি লিখছিল। সে হেলে পড়ে ফোন ধরলো।

নয়ন ভাই বললেন, কবির, একটু আসবা।

শামস কবির কম্পিউটারে সেভ কমান্ড দিলো। তারপর উঠে পড়লো। নয়ন ভাই ডাক দিলে সঙ্গে সঙ্গেই যেতে হয়।

স্লামালেকুম— নয়ন ভাইয়ের কাচঘেরা কক্ষের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে শামস কবির বললো।

আসো। বসো। খুব এক্সাইটিং একটা খবর আছে কবির— নয়ন ভাই একটা ফ্যাক্সে পাওয়া কাগজ পড়তে পড়তে বললেন।

জি নয়ন ভাই ? বসতে বসতে বললো শামস কবির।

ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া লিমিটেড-এর নাম শুনছো ? খুব বড় একটা এজেন্সি। খালি নামেই ইন্টারন্যাশনাল না, কামেও ইন্টারন্যাশনাল। ওরা বাংলাদেশে সাব-এজেন্ট নেবে। আমরা চিঠি লিখছিলাম। ওরা জবাব দিছে— নয়ন ভাই ফ্যাক্সের কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

শামস কবির চিঠিটা পড়লো। বুঝলো, দিন পনেরো পর ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার প্রতিনিধি সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় আসবে। তারা উপনয়ন লিমিটেডের কাজ-কর্ম সাজ-সরঞ্জাম দেখবে। পছন্দ হলে সাব-এজেন্সি দিয়ে দেবে।

সাব-এজেন্সি পেলে কী লাভ ?

কী বলো। সোনার হরিণ ধরা হইয়া গেলো। ওই এজেন্সির যতো কাজ আছে, বাংলাদেশে সেগুলো আমরা করবো। ওদের ক্লায়েন্ট বাংলাদেশে আমাদের ক্লায়েন্ট হবে।

তাহলে তো আমাদের কাজে লেগে পড়তে হয় নয়ন ভাই। অফিস ঝকঝকে-তকতকে, ফাইলপত্র সব আপটুডেট।

ঠিক। তোমার উপরেই আমার মেইন ভরসা। আর রসিদ ভাইকে দেবো গেস্টের থাকা-খাওয়া এন্টারটেইনের দায়িত্ব। কী কও।

জি। সেটাই ভালো।

শামস কবির ভেতরে ভেতরে একটু উত্তেজনাই বোধ করতে লাগলো। এটা যদি হয়, তাদের প্রতিষ্ঠানটা অনেক বড়ো হয়ে যাবে। তার বেতনও বেড়ে যাবে। অনেক অনেক টাকা।

টাকা পেলে সে কী করবে টাকা দিয়ে। ভালো জায়গায় একটা সুন্দর বাসা ভাড়া নেবে। তারপর ভালো আর্টিস্ট কি আর্কিটেক্টকে দিয়ে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ডিজাইন করাবে। অন্য রকমভাবে সাজিয়ে রাখবে ঘরদোর।

তারপর নিয়ে আসবে নীলকে।

নীল দেখবে। মুগ্ধ হয়ে যাবে। সে তাকিয়ে থাকবে নীলের চোখমুখের দিকে। আর কিছু নয়, ওর মুগ্ধ চেহারাটা একটু দু'চোখ ভরে দেখতে চায় শামস কবির। আর কিছু নয়।

ইস, আবার নীলের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এখন কি অফিস থেকে তার ফোন করা উচিত ?

অবশ্য সে টেলিফোনের জন্য আবেদন করেছে। দালালও ধরেছে একজন। দালালটা বলেছে, দু'একদিনের মধ্যেই টেলিফোনের লাইন বাসায় লাগিয়ে দেবে। শামস কবির ফোন করবে। রিসিভ করবে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিতে হবে। পঁচিশ হাজার টাকা— এক সঙ্গেই, ব্যস। তা যদি হতো।

নাহ্। শামস কবির নিজেকে দমন করতে পারলো না। নিজের টেবিলে বসে ফোনটার দিকে তাকালো। কেউ ব্যবহার করছে না। অফিসের চারপাশে একবার দৃষ্টি বোলালো। কেউ কি তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে ? করছে না। শামস কবির উঠলো। ফোনের কাছে গেলো। সে বোতাম টিপছে। তার বুকের ভেতর থেকে শব্দ আসছে— টিপ টিপ।

রিং হচ্ছে, রিং হচ্ছে— বুকের ধুকপুকুনিতে মনে হচ্ছে, সে মরেই যাবে।

হ্যালো— নীলের গলা।

কী করছো ?

এই তো। গোসল করছিলাম। কেবল বেরোলাম।

মাথায় কি এখন তোয়ালে বেঁধে রেখেছো।

হ্যাঁ।

তোয়ালের রং কি নীল ?

হ্যাঁ। কেন ?

পরনে কী ?

বাসায় যেসব পরি। লং ড্রেস।

সিনেমার নায়িকাদের মতো ?

হি হি হি। তা কেন হবে ? সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো।

সাধারণ বাঙালি মেয়েরা শাড়ি পরে। বলো, শহুরে মধ্যবিত্তের মতো।

ওই তো বাবা। সেটাকেই আমি সাধারণ বললাম।

কী রঙের।

এই তো। খয়েরি টাইপ।

এই। ভেতরে আর কিছু পরো নি ?

এই দুষ্টুমি হচ্ছে কেন। শামস কবির, তোমার কী হয়েছে বলো তো ?

তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। ভীষণ ভীষণ!

উপায় কী ?

আমি চলে আসি ?

কোথায় ?

তোমার বাসায়।

না।

কেন না ?

তুমি জানো, আমি তোমাকে কতো আলাদাভাবে দেখি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা একটা অন্যরকম ব্যাপার। সেই ডেলিকেসিটা নষ্ট করতে ঠিক চাই না।

না। নষ্ট হবে না। তুমি ঠিকানা বলো।

ঠিকানা বলবো না।

ঠিকানা না বললেও আমি আসতে পারবো।

কী করে ?

খুঁজে বের করবো। ঢাকা শহরের প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দেবো। বলবো, এ বাড়িতে কি নীল আছে। স্বর্গ থেকে ছিটকে পড়া এক তরুণী— নীল!

বাহবা। তুমি এতো রোমান্টিক! অমন করে খুঁজে যদি তুমি আমার ঠিকানা বের করতে পারো, আসো।

ইস। টেলিফোনের তার বেয়ে যদি যেতে পারতাম।

সে টেকনোলজিও নিশ্চয় বেরোবে।

নীল। এক্ষুণি তোমাকে না দেখলে আমি মরে যাবো!

ইস! কেমন করে বলছে! আমার বুঝি খারাপ লাগে না!

সত্যি বলছি।

কবি, তোমার সঙ্গে আমার আগে দেখা হলো না কেন?

কেন সমস্যা কী? এখন দেখা হওয়ায় কী সমস্যা হয়েছে। তুমি কি বিবাহিতা?

নাহ্।

তুমি কি ডিভোর্সড?

আরে না। বিয়েই হয় নি! সত্যি বলছি।

তাহলে সমস্যা কী? তোমার কি খুব পাকাপোক্ত একটা প্রেম আছে?

না। সে সৌভাগ্য তো আমার হয় নি।

তাহলে কী সমস্যা? জীবনের একদিনের ভুলে তোমার পেটে বাচ্চা এসে যায়। এক সঙ্গে দুটো বাচ্চা। যমজ। ওরা এখন ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে?

আরে না।

তাহলে?

অন্য ধরনের সমস্যা। ঠিক সমস্যাও নয়। আমাদের রোজকার জীবনের কিছু কাদা থাকে। গ্লানি থাকে। সে সবের মধ্যে আমার কবিকে আমি নামাতে চাই না।

শোনো নীল! যদি এখন দুটো বাচ্চাও থাকে, তবু তুমি আমার নীল। তুমি আমাকে পঙ্ক থেকে তুলে এনে জীবন দিয়েছো। তুমি জানো না তুমি কী।

এমন করে বলো না। ঠিক আছে, চলো, নেক্সট শুক্রবার বেড়াতে যাই কোথাও।

পরবর্তী শুক্রবার লাগবে না। তার আগেই [illegible] খাবো।

সত্যই তাই। বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা শামস কবির ফোন করলো নীলকে। নীল বাসায় আছো?

হ্যাঁ।

কী দিয়ে ভাত রেঁধেছো?

তেমন কিছু নয়। মাছভাত।

মাছের কাঁটা বাছতে পারো?

হি হি। পারি।

বাছো? একটা পেটির কাঁটা বেছে রাখো। আর এক ছটাক চাল বেশি চড়াও। আজ অতিথি আসবেন খেতে!

দুপুরবেলা দরজায় নক।

দুপুরবেলা কে এলো? সচরাচর কেউ তো আসে না। আসার কথা নয়। দরজার ম্যাজিক হোল দিয়ে তাকালো নীল। ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে সে তার খুব চেনা— শামস কবির।

সে দরজা খুললো। কী আশ্চর্য! তুমি!

হ্যাঁ, আমি।

ঠিকানা পেলে কোথায়?

ঠিকানা পাইনি তো। ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়িতে নক করছি। আজ এ পাড়ায়

ঢুকেছি। বত্রিশটা বাড়িতে নক করা শেষ। এটা তেত্রিশ নম্বর বাড়ি। কী ভেতরে ঢুকতে দেবে না?

আরে কী বলো! এসো এসো।

শামস কবিরের হাতে একটা গোলাপ ফুল ছিল। সে সেটা তুলে দিলো নীলের হাতে।

ফ্লাটটা খুব সুন্দর করে সাজানো। অবশ্য আসবাব কিছুই নেই। সুন্দর রঙিন কার্পেট। আর কতোগুলো কুশন। কুশন কভারগুলো সুন্দর। টবে বড় বড় গাছ।

শামস কবিরকে জুতা খুলতে হলো। সে বললো, জুতা খোলাটা ঝামেলা। বত্রিশটা বাসায় হেঁটে হেঁটে যেতে হয়েছে। কতো ঘাম ঝরিয়েছি, বুঝতেই পারছো। মোজায় নিশ্চয় গন্ধ হয়েছে।

সত্যি? এই কী করে পেলে ঠিকনাটা?

সেটা অবশ্য শামস কবির বলে দিতে চায় না। ব্যাপারটা খুবই সহজ। সে তার টিএন্ডটির দালালকে বললো, এক হাজার টাকা দেবো, নগদ। এই নম্বর টেলিফোনের ঠিকানাটা বের করে দিতে হবে। বিলিং সেকশনে গেলেই পাওয়া যাবে। এক হাজার টাকার তুলনায় এ কাজটা রীতিমতো সহজ। দালাল (তার নাম খোরশেদ মিয়া, বয়স চল্লিশ, দালালি ছাড়াও তিনি সেকেন্ড ডিভিশন পর্যায়ে ক্রিকেটের আম্পায়ার) কাজটা করে দিলেন পরম আগ্রহ নিয়ে।

বাসায় কেউ নাই? শামস কবির জিজ্ঞেস করলো।

আছে। মা আছে। তুমি বসো। আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি— নীল উঠলো।

নীল পরে আছে ঘরে পরার পোশাক—ম্যাক্সি আর কী! চুল সহজ ভঙ্গিতে খোঁপা করা। আলোর বিপরীতে হাঁটার সময় তার পোশাকটাকে একটু স্বচ্ছ মনে হলো।

মা এলেন। কঠিন প্রকৃতির মহিলা বলে তাকে মনে হলো। নাকের ডগায় চশমা। তাকে দেখাচ্ছে, ইংরেজির শিক্ষিকার মতো।

তোমার নাম কী, তোমরা কয় ভাইবোন, বাবা কী করেন, তুমি কী করছো— তিনি এমনভাবে প্রশ্ন করছেন, যেন থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তোমরা গল্প করো, আমি এখনো গোসল করিনি। তিনি উঠলেন। ঘরে ঢুকলেন। তার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেলো।

এই, তুমি তো ভাত খাবে, না? দাঁড়াও, মার গোসল করা হোক। এক সঙ্গে খাবো।

আচ্ছা।

আমার ঘরে যাবে? চলো।

চলো।

শামস কবির, তুমি কোথায় যাচ্ছো? একটা মেয়ের ঘরে যেতে তোমার পা কাঁপছে না, বুক কাঁপছে না।

না।

নীলের ঘরটাও ছবির মতো। পরিষ্কার। এককণা ধূলি নেই। এক কোণে একটা বিছানা।

মেঝেতেই। গান শোনার যন্ত্র। আর বই। সব মেঝেতে।

কেউ আমার ঘর পর্যন্ত আসতে পারে না। তুমি পারলে, কবি। নীলের গলা কেমন অন্যরকম শোনাচ্ছে।

সে এগিয়ে এলো শামস কবিরের কাছে। বললো, একটু আদর করো।

শামস তাকে আলিঙ্গনে বাঁধলো। ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু দিলো। তার শরীর অবাধ্য হয়ে উঠতে চাইছে। হাত চঞ্চল।

নীল বললো, না, কবি না। এখনই না।

কবির সরে এলো।

মন খারাপ করলে? নীল বললো।

নাহ্, আমারই বাড়াবাড়ি। তুমি কিন্তু কিছু মনে করো না। আর কোনোদিন আমি এমন করবো না।

চলো। মা'র গোসল হয়ে যাবে। বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।

চলো।



নয়ন চৌধুরী সাংঘাতিকভাবে চিন্তিত। তার সামনে বসা রসিক সরকার। নয়ন চৌধুরী বললেন, শালা ব্যবসা করতে আইসা কি মেয়ে মাইনষের ভাড়ুয়া হইতে হইব।

রসিক সরকার বললেন, সত্যি। এই ফরেনারগুলোকে নিয়ে পারা যায় না! এসেই বলবে, তোমাদের এখানে নাইট লাইফ কই?

নাহ্। এতো আশা করছিলাম। টাকা-পয়সাও তো কম ইনভেস্ট করলাম না। সব শালা গোল্লায় গেলো। বিজনেসটা আর পাওয়া গেলো না।— নয়ন চৌধুরী বললেন।

পাওয়া গেলো না! এ কথা এখনই বলছেন কী করে? পাওয়া যেতেও তো পারে।

পাওয়া যেতে পারে মানে? এখন শালা আমি মেয়ে মানুষ নিয়া ওই শালার রুমে দিয়া আসবো নাকি? বিজনেস আমি কম দিন ধরে করি? কোনোদিন দুই নম্বরি করি নাই।

না বস, আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। রবার্ট তো বলে নাই আমাকে মেয়ে সাপ্লাই দাও। সে বলেছে, নাইট লাইফ কী আছে তোমাদের?

ওই একই কথা। নাইট লাইফ আবার কী। পাঠায়া দেন শালারে টানবাজার।

হে-হে-হে। এটাই তো সমস্যা। ব্যাটাদের প্রিয় জায়গাতো ব্যাংকক, এমনকি গোয়া বিচে গেলেও তো এসব নিয়েই থাকে। আচ্ছা। আপনি ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দেন।

আপনার উপরে ছেড়ে দেবো মানে?

অফিসিয়ালি ব্যাপারটা নেবেন না। আনঅফিসিয়ালি ভাবি। আমাদের একজন বন্ধু। যে নিজে ওই ধরনের, সে তো এসবের খোঁজ-খবর চাইতেই পারে। এটা তো বিজনেস পাওয়ার প্রি-কন্ডিশন না।

অ! আপনে তো আবার সাতঘাটের পানি খাওয়া মানুষ। দেখেন, আমি কিছু শুনতে চাই না। কান বন্ধ করলাম।

নয়ন চৌধুরী লোকটা যে এতো নরম প্রকৃতির এ ঘটনার আগে বোঝা যায়নি। তিনি ভীষণ মনখারাপ করলেন। মানুষ কেন মানবতার এই অপমানটা এতোদিন পর্যন্ত চলে আসতে দিচ্ছে— এটা ভেবে তার মনখারাপ। শামস কবিরকে ডেকে তিনি বললেন, কবির, তুমি তো কবিতা লেখো, না ? নারীকে অপমান করে যে-পুরুষ, তার বিরুদ্ধে লিখতে পারবা। পারতে হবে। ধরো, তোমার সঙ্গে আমার প্রেম হইলো, আমি তোমার সঙ্গে বেড়ে যাইতে চাইলাম, সেইটা একটা কথা— আর আমি জানি না শুনি না একটা মেয়ে মানুষরে ধইরা ঘরে লইয়া গেলাম, রাত শেষে টাকা দিলাম— এইটা কী ধরনের কথা। শালা মানুষের রুচি এতো খারাপ কেন ?

ছিন্নবিচ্ছিন্ন নানা সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যাবলম্বনে ঘটনা যা বুঝতে পারলো শামস কবির, তাতে তারও মনখারাপ। আসলেই তো, মানুষের জন্য এটা খুবই অবমাননাকর একটা ব্যাপার। তবুও এটা কীভাবে চলে আসছে দিনের পর দিন।

নয়ন চৌধুরী ডেকে বললেন শামস কবিরকে, কবির, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারো ?

জি, পারি।

কাল সকালে ঘুম থেকে উঠবা ছয়টায়। গোসল-টোসল নাশতা-টাশতা করে রেডি হবা সাতটার মধ্যে। বের হয়ে রওনা দিবা উত্তরার দিকে। ওইখানে গিয়া পৌঁছবা সকাল আটটায়। এস্টোরিয়া রেস্ট হাউজ। ওই ব্যাটা রবার্ট রেডি হইয়া থাকবে। গাড়িও থাকবে ওখানে, তাকে নিয়া রওনা হবা কুমিল্লা। ব্যাটা, ময়নামতি বৌদ্ধবিহার দেখতে যাইতে চায়। তুমি সঙ্গে থাকবা। আমি শালার সাথে যাবো না। বুঝছো।

জি, বুঝেছি।

বৌদ্ধ বিহার-টিহার সম্পর্কে কিছু জানো তুমি ? মিউজিয়ামে ফোন করো। বইপত্র জোগাড় কইরা পইড়া ফ্যালো।

জি আচ্ছা।

ভোরবেলা রওনা হলো শামস কবির, উত্তরার দিকে। নভেম্বর শেষ হয়ে আসছে। তবু ঢাকায় তেমন শীত পড়ে নি। কিন্তু স্কুটারে বসে বাতাসে তার শীতশীতই করছে। কিছুদিন আগে জ্বরে পড়েছিল, শরীর এখনো সে ধকল সামলাতে পারে নি মনে হচ্ছে।

এস্ট্রোরিয়া রেস্ট হাউজটা খুঁজে পেতে একটু ঝামেলা হলো। রোড মিলছে, কিন্তু বাসা মিলছে না। শামস কবির স্কুটার ছেড়ে দিলো। একা একা হেঁটে বাড়ি খোঁজা সহজ।

রোদ উঠেছে। সোনা রঙের রোদ। দু'পাশের ঘাসে শিশির, ঝকঝক করছে। রোদ এসে

চোখে পড়ছে। শামস কবির বাঁ হাত চোখের উপরে ধরলো। রোদটা কিন্তু তার মিষ্টিই লাগছে।

ঋতুবদলের এ সময়গুলোতে শামস কবিরের বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। তার খুব মনে পড়ে শৈশবের কথা। দিনাজপুরে তাদের একতলা টিনে ঢাকা বাসাটার সামনে কতো সুন্দর বাগান ছিল। ফুলগাছ, মাধবীলতার ঝাড়তো ছিলই, ছিল সবজিক্ষেত। তারা নিজ হাতে মাটি কুপিয়ে বছরের এই সময়টাতে লাগাতো ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, শালগমের চাড়া। তিন ভাই রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় টিউবওয়েলের পাড় থেকে বালতি বালতি পানি নিয়ে যেতো সবজিক্ষেতে। খুব সুন্দর একটা ঝাঝড়ি ছিল তাদের। সকালবেলা ঘন কুয়াশার মধ্যে সূর্যের কমলা আলো, মাটিতে মিইয়ে আছে কচি কচি চারাগুলো— ওরা পানি ঢালতো। মা আঙিনায় বসে তাদের জন্য বুনতেন উলের সোয়েটার। বাবা হয়তো তখন কেবল ফিরছেন মর্নিং ওয়াক সেরে। এমনি ঋতুবদলের দিনগুলোতে শামস কবিরের চোখের সামনে খুলে যায় শৈশবের লাল দরজা।

ছোটি মাটি পিঁপড়া বোটি লাল দরজা খোল দে...

রেস্ট হাউজটা খুঁজে পাওয়া গেলো। বাইরে থেকে এর স্থাপত্য নকশা দেখে শামস কবিরের ভিরমি খাবার যোগাড়। গথিক স্টাইলের বাড়ি। কারুকার্যময়। কেবল এর দরজা জানালায় কাঠের যে কাজ, তা দেখেই তো একটা জীবন ব্যয় করা যায়।

গেটে উর্দিপরা দারোয়ান। কার কাছে যাবেন— এ প্রশ্ন গেটেই শুনতে হলো। সে সোজা গেলো রিসেপশনে। বোর্ডারের নাম বললো। নিজের পরিচয় দিলো।

সাত নম্বর রুম— রিসেপশন থেকে জানানো হলো।

ইন্টারকমে আমি একটু কথা বলতে চাই।

ও শিয়োর। ভদ্রলোক গলে পড়লেন।

রিং করে ফোনের রিসিভার শামস কবিরের হাতে তুলে দিলো লোকটা। রিং হচ্ছে। এখন আবার শালা ইংরেজিতে কথা বলতে হবে।

হ্যালো। দিস ইজ কবির ফ্রম উপনয়ন।

ও হ্যালো, গুডমর্নিং।

গুডমর্নিং। নয়ন চৌধুরী সেন্ডস মি টু ইউ এজ এ গাইড। আই উড লাইক টু বি উইথ ইউ টু ময়নামতি।

ও শিয়োর। শিয়োর। প্লিজ কাম টু দি রুম নম্বর সেভেন।

থ্যাংক ইউ। আই এম কামিং।

কক্ষ নম্বর সাতের সামনে গেলো শামস কবির। প্রতিটা দরজা সেগুন কাঠের, ভারী কাঠের কাজগুলো সম্ভ্রম উদ্রেককারী।

সে দরজায় নক করলো। মে আই কাম ইন স্যার?

কাম ইন।

দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো।

কিন্তু মুশকিল হলো বুক ভেঙে বেরিয়ে আসছে চাইছে রোদন। চলন্ত বাসের আওয়াজও সে গোঙানিকে আড়াল করতে পারছে না।

আজ ভোরবেলাতেও সে ছিল এ শহরের সবচেয়ে বড় শাহেনশাহ।

আজ সকালেই সে একজন নিঃস্ব দীনহীন কুষ্ঠরোগী, কেমন তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেলো তার স্বপ্নসৌধটি!

কতো অনিশ্চিতই না মানবজীবন! মানুষের চলার পথে কতো চোরাবালির ফাঁদ। কে কখন ধরা পড়ে কে জানে!

এই যদি তোমার আসল রূপ, তাহলে কেন তুমি নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলে উর্বশী বলে, অপ্সরা বলে ? কে তোমাকে বলেছিল আগবাড়িয়ে ফোন করতে, কে তোমাকে বলেছিল গায়ে পড়ে এমন ভাব দেখাতে ? আমি তো আগে তোমার কাছে যাইনি, তুমিই এসেছো। কেন এসেছিলে ?

হায়। আমার অদৃষ্টটাই এমন। জীবনের আঠাশটি বছর আমি কোনো নারীকে ভালোবাসলাম না, কারো সঙ্গ, সান্নিধ্য, সংলাপ উপভোগ করলাম না। এতোদিন পর যে-একজনের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়লো আমার সর্বস্ব, যাকে সমর্পণ করলাম আমার প্রাণভোমরাধারী কৌটাটি সেই কি না... ছি ছি ছি!...

শেরাটন হোটেলের মোড়ে বাস থেকে নেমে পড়লো সে। রাস্তা পার হলো। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলো। তারপর ঢুকে পড়লো বারে। টেবিলে বসার আগে চেক করে নিলো মানিব্যাগে টাকা আছে কি না। সিরাজ ভাই ঠিক ভালো জায়গাই চিনিয়েছেন। হ্যান্ড্রেড পাইপার্স— সে অর্ডার দিলো।

প্রায় অন্ধকার বারে একটা টেবিলে শামস কবির একা। কী শামসু মিয়া, এখানে তুমি কী করো ? গেলাসে চুমুক দিয়ে সে নিজেই প্রশ্ন করলো নিজেকে। আমার মা মরে গেছে, মনে বড়ো দুঃখ— সে আপন মনে বিড় বিড় করছে। তার হাসি আসছে। সত্যি তো— এ হলো মায়ের মৃত্যু। মা নামের যে এক ধারণাকে মানবসভ্যতা দীর্ঘদিন ধরে পুজো করে আসছে, আজ সকালে তার চরম অবমাননা দেখেছে শামসু। এই মেয়েও তো কারো না কারো কন্যা, কারো বোন, আবার কারো মাও হয়তো। সে তো তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। দেবতারাও এদের তল পায় না, আর তুমি কোন ছার। নাহ্, ওই টপস-স্কার্ট পরা মেয়েটি তুমি নও, নীল। ও অন্য কেউ! তাই হবে! সে তো মহাগাধা। ওই মেয়েটিকে কেন সে তার নীল বলেই ভাবছে। সে তো অন্য কেউ হতে পারে। হয়তো নীলের জমজ বোন-টোন। হয়তো অন্য কেউ, যার সঙ্গে নীলের চেহারার অলৌকিক মিল! তাই যেন হয়, তাই যেন হয়!

বাসায় সে ফিরলো মধ্যরাতে। চিৎকার, চেঁচামেচি করে গেট খোলালো। চার তলার ঘরে ঢুকে প্রথমেই বের করলো তার কবিতার খাতাটি। একটার পর একটা কবিতায় সে অকারণে নারীর স্তব করেছে। নারীদের ভেবেছে স্বর্গীয় কোনো ব্যাপার। তাদের ভেবেছে অ্যাঞ্জেল। আসলে তারা তা নয়। তারা মর্ত্যের মাংসল জীব একেকটা! খুব সাধারণ। পুরুষদের মতোই স্থূল, রক্ত মাংসময়, লোভী।

ঢুকে সে যা দেখলো তা যদি সে না দেখতো তাহলেই ভালো হতো। এ দৃশ্য সে কি সত্যই দেখছে, না সবই চোখের ভুল। তার মনে হচ্ছে, এর পুরোটাই স্বপ্নদৃশ্য— একটু পরে স্বপ্ন ভেঙে গেলে তার মনে হবে, যাক বাবা, বাঁচা গেলো।

রবার্টের পাশে একটা তরুণী। ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তার দিকে চলে গিয়েছিল। মেয়েটা টপস আর স্কার্ট পরা। ছোট স্কার্ট। পা বেরিয়ে আছে। টিউবলাইটের মতো ফর্সা দুটো পা। তার চোখে-মুখে রাতজাগা ক্লান্তি।

মেয়েটা আর কেউ নয়— নীল।

শামস কবিরের চোখমুখ লাল। দেহের সমস্ত রক্ত মুখে উঠে এসেছে। নীলেরও।

কেউ কোনো কথা বললো না খানিকক্ষণ।

রবার্টের বাঁ পাশে নীল বসে আছে। সোফায়। তাদের সামনে দু'কাপ চা।

রবার্ট বললো, হেলো, ক্যান ইউ সিট হেয়ার ফর ফাইভ মিনিটস। আই উড লাইক টু বেগ ইয়োর পারডন টু সে দিস লেডি গুড বাই।

শামস কবির বললো, ওকে, ওকে।

তারা বেরিয়ে গেলো। শামস কবির মাথা নিচু করে বসে রইলো। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সে তার সমস্ত শক্তি কণ্ঠে তুলে এনে চিৎকার করে কাঁদে। মনে হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীটাকে মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারে। এই সোফা এই কাচে ঢাকা টেবিল, এই বিছানা।

বিছানা! বিছানার দিকে তাকিয়ে সমস্তটা শরীর ঘিনঘিন করে উঠলো শামস কবিরের। বিছানাটা এখনও এলোমেলো হয়ে আছে। ছি!

এয়ার কন্ডিশন মেশিন চলছে। ঝিমঝিম শব্দ হচ্ছে। শামস কবিরের কপালে ঘাম। দেওয়ালে কার যেন আঁকা একটি চমৎকার পেইন্টিং। শামস কবির সেদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে!

এই বদমাশটার সঙ্গে কেন সে যাবে ময়নামতিতে? সে যাবে না। যেতে পারবে না। গেলেও চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে সে ফেলে দিতে পারে বদমাশটাকে। যে-কোনো কিছু করে ফেলতে পারে। যে-কোনো কিছু।

সে আবার রিসেপশনে গেলো। ফোন করলো নয়ন চৌধুরীর বাসায়। ফোন ধরলেন তাঁর স্ত্রী। ভাবি, আমি কবির, নয়ন ভাইকে একটু দেন না।

ও তো ঘুমুচ্ছে। সর্দি-ধরা গলায় ভাবি বললেন।

তবু দিন। ডেকে দিন। আমার খুব বিপদ। খুব...। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো শামস কবির।

নয়ন ভাই ধরলেন খানিক পর। হ্যালো, কবির, কী হয়েছে।

সর্বনাশ হয়ে গেছে নয়ন ভাই। আমার মা মারা গেছেন।

কী বলো! ইন্নালিল্লাহে...।

নয়ন ভাই, আমি পরে সব জানাবো। এখন আমি তো উত্তরা যেতে পারছি না। আমি

রবার্টকে ফোন করে বলেছি আপনি সঙ্গে যাবেন। আপনি কি আসবেন ?

আচ্ছা ঠিক আছে। ও কি আধঘন্টা বসতে পারবে ?

হ্যাঁ। আমি বলেছি আধঘন্টা দেরি হবে।

গুড। ঠিক আছে আমি রেডি হচ্ছি। নয়ন ভাই ফোন রেখে দিলেন।

ফোন রেখে ফিরে তাকাতেই দেখা পাওয়া গেলো বরার্টের। স্যার। জাস্ট নাউ আই হ্যাভ গট এন আর্জেন্ট কল। আই এম স্যরি টু সে দ্যাট আই এম নট গোয়িং উইথ ইউ। মি. নয়ন চৌধুরী ইজ কামিং উইথইন হাফ এন আওয়ার টু বি উইথ ইউ।

সাউন্ডস গুড। আই নিড সামটাইম টু গেট মাইসেলফ রেডি। ওকে।

শামস কবির হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো। পৃথিবীটা বড়ই বিচিত্র। বড় বেশি বিপরীতের সমাহার এখানে। যে হাতটি এই মুহূর্তে তার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য, তার হাতটাকেই কিনা মর্দন করতে হলো তাকে!

আজ তার ছুটি। এখন কোথায় যাবে শামস কবির। অফিসে যেতে হবে না। যাওয়ার প্রশ্নও নেই।

বাসায় যাবে ? বাসায় গিয়ে কী করবে ? এই সারাটা দিন ধরে কী করবে সে। সে হাঁটতে লাগলো। এভাবে হাঁটাই ভালো। সময় চলে যাক। [illegible]ও কোনো উদ্দেশ্য নেই। গন্তব্য নেই আজ। তার কোনো তাড়া নেই।

হাঁটতে হাঁটতে বড়ো রাস্তার মোড়। একটি দুটো দোকান আছে এ জায়গাটায়। লোকজনও আছে কিছু কিছু। শামস কবির একটা সিগারেটের দোকানে গেলো। একটা বেনসন কিনলো। আগুন দিন।

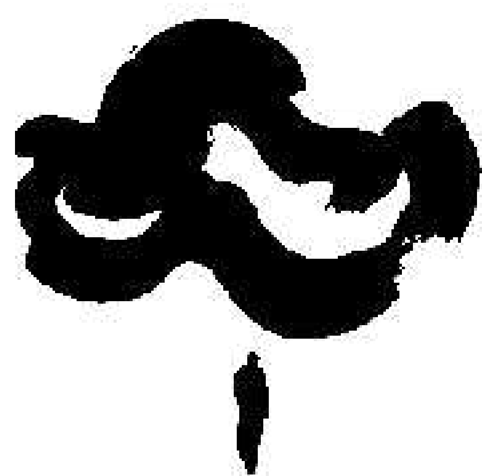
দোকানি লাইটার এগিয়ে দিলো। অনভ্যস্ত হাতে সে ঠিক আগুন জ্বালিয়ে উঠতে পারলো না। দোকানিকে বললো, ক[illegible]ন একটু ধরিয়ে দিন না।

দোকানদার তার মুখের দিকে তাকালো। এ ধরনের চিজ সে এর আগে কখনো দেখেনি— এমনই তার চাউনি। সে লাইটারটায় সামান্য চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা জ্বলে উঠলো। শামস কবির টান দিলো সিগারেটে— জোরে। ধোঁয়া বুকে গিয়ে ধাক্কা মারলো। জ্বলে উঠলো ভেতরটা। জ্বলুক। জ্বলুক। যে যন্ত্রণায় তার সমস্ত অস্তিত্ব আজ জ্বলেপুড়ে খাক, তার তুলনায় এ তো সামান্য।

হাঁটতে হাঁটতে মহাখালী পর্যন্ত চলে এলো শামস কবির। তার বুকের ভেতরটা কেমন করছে। পাকস্থলীর ভেতরে নিশ্চয় হাইড্রোক্লোরিক এসিড ছলকাচ্ছে। ভীষণ বমি বমি লাগছে। রাস্তার ধারে ফুটপাতে বসে সে বমি করার চেষ্টা করলো। পেটে কিছু ছিল না। কিছু পিত্তরস উদগীরিত হলো মাত্র। বিস্বাদে ভরে গেলো মুখের ভেতরটা। আর বমির চেষ্টায় যেন নাড়িভূঁড়ি সব বেরিয়ে এলো গলা পর্যন্ত।

একটা প্রিমিয়াম বাসে উঠে পড়লো সে। এসি বাসে যদি খানিক আরাম লাগে। জানালার ধারে বসে সে মাথা এলিয়ে দিলো কাচে। বাস ছেড়ে দিলো। হু হু করে কান্না আসছে। অশ্রুর বাঁধ ভেঙে গেছে।

কাঁদতে তার ভালো লাগছে।



সাতদিন অফিসে গেলো না শামস কবির। অষ্টম দিনে সে যখন হাজির হলো অফিসে, তার গালের দাড়ি তো খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে।

তোমার নাকি মা মারা গেছে! আচ্ছা ? কী করে মারা গেলেন ? রসিক সরকার গলা আবার যথাসম্ভব কাব্যিক আর সমবেদনায় পরিপূর্ণ করে তুলে বললেন।

মা, তা মরেছে বটে! শামস কবির দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

আহা! তিন কুলে তোমার কেউ রইলো না! রসিদ সরকার আফসোস করতে লাগলেন।

কায়সার বললো, শাম, তোমার নীল তো ফোন করে করে আমাদের অস্থির করে ফেলেছে। তুমি নাকি বাসায়ও ছিলে না। কই গিয়েছিলে ? তোমার মা না আমেরিকা থাকতো ?

গিয়েছিলাম! শামস কবির কথার জবাব দেওয়ায় উৎসাহ পায় না।

শোন। ওই মেয়ে তোমাকে ফোন করতে বলেছে।

শামস কবির আবার কাঁদকাঁদ।

কায়সার নীরবে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। মাতৃবিয়োগের শোকটা সে ঠিক উপলব্ধি করে উঠতে পারছে না। শামস কবির বললো, শোনো, কোনো ফোন টোন এলে আমাকে কেউ দেবে না। আমার মাথার ঠিক নেই। ফোনে আমি কারো সঙ্গে গলা-গুজব করতে পারবো না। কোনো ফোন এলে বলে দেবে, উনি অফিসে নেই।

ফোন কিন্তু আসছে। প্রায়ই দু'তিনবার নীল ফোন করে। জিজ্ঞেস করে, হ্যালো, শামস কবির কি এসেছেন ? আসেন নি ? কোথায় গিয়েছেন ? জানেন না ? আপনাদের একজন সহকর্মী এভাবে হারিয়ে যাবে, আর আপনারা তার খোঁজখবর রাখবেন না ?

শেষে অফিসের একজন বলে দিলো, উনি আছেন, কিন্তু ঠিক সুস্থ না! উনি ফোনে কারো সঙ্গে কথা বলেন না।

এরপর এলো একটা চিঠি। পাতলা চিঠি। খামের উপরে লেখা কবি শামস কবির। চিঠিটা শামস কবির বাসায় নিয়ে গেলো। তার ইচ্ছা, চিঠিটা সে পোড়াবে।

বাসায় গিয়ে কিন্তু তার মন পাল্টাতে লাগলো! কী আছে ভেতরে, পড়েই দেখি না! এমনও তো হতে পারে, সে নিজেই কোনো মস্ত ভুল করেছে। এমন কি হতে পারে না যে, রবার্ট আসলে নীলের বাবা। নীল তার বিদেশী বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সকাল সকাল! কিংবা এমন কি হতে পারে না যে, ওই মেয়েটা আদৌ নীল নয়! লুক-এলাইক নীল! হতে পারে, এ সবই তার নিজের চোখের বিভ্রম!

চিঠিটা রেখে দিলো সে। আজ নয়, আরেক দিন পোড়াবে।

পরদিন অফিসে গিয়ে রসিদ সরকারকে বললো, রসিদ ভাই, সেদিন এস্টোরিয়া রেস্ট হাউসে রবার্টের কক্ষে সাতসকালে একটা মেয়েকে দেখেছিলাম। উনি কে, কিছু জানেন ?

রসিদ সরকার গলায় রসিকতা ফুটিয়ে বললেন, কাকে দেখেছো বলছো, ভূত-প্রেত কিছু!

না না। একটা মেয়ে, মেয়েটা কেন এসেছিল ?

লাগবে নাকি তাই বলো। লাগলে এনে দিতে পারবো!

কী বলছেন এসব ?

হ্যাঁ! টাকা বেশি লাগবে। রেস্টহাউসের ভাড়া, পুলিশের চাঁদা আর মেয়ে-মানুষের চার্জ। টাকা তো সব ওই মেয়ের ব্যাগে যায় না।

থাক। আর বলতে হবে না। আপনি যে কীসব বলেন!

রসিদ সরকার ঠিক হো হো করে হাসে। জানো শামসু, আমরা কিন্তু সাব-এজেন্সিটা পেয়ে যাচ্ছি। মেয়েটা বড়ো কাজের।

চুপ করেন তো! কথা বেশি বলেন কেন ? শামস কবিরের কণ্ঠস্বর অসহিষ্ণু।

নাহ্, রসিদ সরকার মিথ্যা বলছেন। বানিয়ে বলছেন। এ ধরনের বিষয়ে তিনি সব সময়ই একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে পছন্দ করেন।

আজ তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলো শামস কবির। খামটা বের করলো। নেড়ে-চেড়ে দেখলো। তারপর ধীরে ধীরে খামটা খুলে ভেতর থেকে চিঠি বের করলো।

দেখো কবি, আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনাটা সম্প্রতি ঘটে গেলো! এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা অনেকটা আমারই নিয়তির অংশ।

নিশ্চয় তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারছো না। পারা উচিতও নয়।

তাহলে দেখো, প্রতিদিন কীভাবে ক্ষমার অতীত এক জীবন আমি বয়ে চলেছি।

বইতে বড়ো কষ্ট হয়। খারাপ লাগে। ক্লান্তি আসে। তবুও বয়ে বেড়াই। যেন এই আমার ভবিতব্য। ধরা যখন পড়েই গেছি, তখন নিজেকে লুকোবো না। আমার আসল নাম নিশ্চয় নীল নয়। নীলিমাও নয়। এ আমারই দ্বিতীয় সত্তা। যাকে আশ্রয় করে আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। প্রতিদিন পঙ্কের ভেতরে ফোটাতে চেয়েছিলাম এক নির্মল পঙ্কজ।

সে জন্যই স্মৃতি ঘেঁটে বান্ধবীর মানসপুরুষটিকে খুঁজেপেতে বের করেছিলাম। একজন কবির জীবনের নিভৃত প্রেরণা হয়ে কিছু সৃষ্টির পেছনে থাকতে চেয়েছিলাম।

তা তো আর হলো না।

তবুও জানো, নিজেকে রোজ কীভাবে সান্ত্বনা দিই ? বলি, মানুষ তো সব সময়েই তার প্রতিভা বিক্রি করে খায়। সুন্দরমুখ মেয়েটি বিক্রি করে তার মুখসৌন্দর্য। শক্তিশালী পুরুষটি মুষ্টিযুদ্ধ করে, কুস্তি লড়ে। যে ভালো ক্রিকেট খেলে, পড়া নেই শোনা নেই, রোদে পুড়ে পুড়ে সে সারাক্ষণ মাঠেই পড়ে থাকে। আমার যে আর কোনো প্রতিভা নেই। তাই...

আমাকে তুমি সেদিন যে-ভাবে দেখেছো ধরো সেটা আমার প্রফেশন! আর তোমার সঙ্গে

আমার যে সম্পর্ক, সেটা হলো ভালোবাসা। দুটোকে এক ক'রে দেখো না।

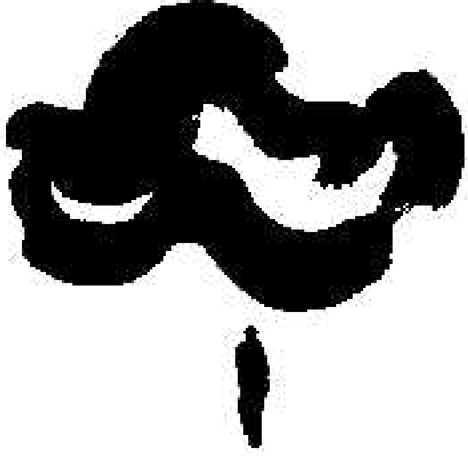
এ কথা লিখতে আমার হাত সরছে না। চোখের জলে কাগজ ভিজে যাচ্ছে।

কিন্তু সত্যি বলতে কি, তোমার প্রতি আমার যে টান, তার পেছনে কোনো মতলব নেই, কোনো কলুষ নেই।

আমার জীবনের কোনো গ্লানি যেন তোমার জীবনকে স্পর্শ না করে।

ব্যস। এতোটুকুনই চিঠি। ইতি নেই। সম্বোধন নেই।

চিঠিটার দিকে শামস কবির তাকিয়ে থাকে। তার গলায় কী যেন আটকে আছে! বোধ করি, বিষণ্ণতার দলা!



শামস কবির উপনয়ন লিমিটেডের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। কপি-রাইটারের কাজ সে আর করবে না। সে কবি। সে কবিতা লিখবে। একটা পঙ্‌ক্তির জন্য সে অপেক্ষা করবে। অপেক্ষাও নয়, প্রতীক্ষা করবে। দিনের পর দিন। নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে চাইবে কবিতার পঙক্তি! নীলিমার কাছে চাইবে!

কিন্তু চাকরির অংশ হিসেবে লেখালেখি করা— এটা সে করবে না।

এই তো সেদিন সে লিখছিল— ভোরের আলোর মতো পবিত্র...

নয়ন ভাই লাইনটা কেটে দিয়ে বলেছিলেন, কবির, কাব্য করছো ক্যানো? তুমি তো কবিতা লিখতেছো না, অ্যাডের স্ক্রিপ্ট লিখতেছো!

ভালোবাসা আর প্রফেশনকে এক করতে নেই।